দ্বিচারিণী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দ্বিচারিনী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শ্বেতপদ্ম প্রকাশন
বাংলাবাজার, ঢাকা।

দ্বিচারিনী
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক
শ্বেতপদ্ম প্রকাশন
বর্ণবিন্যাস
শেখ আহম্মেদ চিশতী
টেকনিক কম্পিউটারর্স
গ্রাফিক্স ডিজাইনে
তরুন
মুদ্রণ
ধানসিঁড়ি প্রেস ঢাকা

মূল্য ঃ ৬০ টাকা।

।। এক ।।

কুসুমকুমার

আমি জানি কলকাতায় সূর্য ওঠে তিলজলা থেকে এবং অস্ত যায় হাওড়ায়। গ্রীষ্মকালে কলকাতায় যে ফুরফুরে একটা দক্ষিনা হাওয়া বয়ে যায় সেটা আসে গড়িয়াহাটা থেকে। আর শীতের উত্তুরে বাতাসটার জন্মস্থান হল কুমোরটুলি। কলকাতা শহরটা আমি বেশ চিনি। বিশেষ করে তার অলিগলি। গলিপথ আবিস্কারে আমি হচ্ছি একজন বিশেষজ্ঞ। দুরূহ, দুর্গমতম গলিপথগুলিও আমি কররেখার মত চিনি। শ্যামবাজার এসপ্লানেড বা গড়িয়াহাটার ভিড়ের মধ্যেও আমি মানুষের গায়ে গায়ে আমার নিজস্ব গলিপথ তৈরি করে নিতে পারি, কাউকে না ঠেলে, না ধাক্কা দিয়ে, কারও পা না মাড়িয়ে ফুরফুর করে আমি বেরিয়ে যাই, কেউ টেরও পায় না। আমাকে গলিবাজ বললে অত্যুক্তি হয় না।

মাধ্যমিকে আমি অঙ্কে পেয়েছিলাম ষাট। সব মিলিয়ে ওটাই আমার সর্বোচ্চ নম্বর। বলতে নেই, অঙ্কে আমি বেশ ভাল। গরিবের অঙ্ক জানতেই হয়, অঙ্ক না জানলে তার চলে না। তার পদে পদে অঙ্ক, প্রতিটি সিদ্ধান্তেই হিসেব নিকেশ। এই অঙ্কের জোরেই আমি তিন হাজার টাকার ভাউচারে সই করে মাত্র আটশো টাকা মাইনে পেয়েও দিব্যি বেঁচে বর্তে আছি। এই অঙ্কের জন্যই আমি মধুসূদনবাবুর বাড়ির আউট হাউজে মাথা গোজার মত একটু জায়গা পেয়েছি। আমি তাঁর আট বছরের ছেলে অমিতকে অঙ্ক শেখাই। না, তিনি আমাকে মাইনে দেন না, শুধু থাকতে দেন। তাও যথেষ্ট। কলকাতায় থাকাটাও কম নাকি! আমার সঙ্গে একই ঘরে থাকে বাড়ির চাকর গোকুল। এমনিতে কোনও অসুবিধে নেই, গোকুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালই। তবে তার একটু মেয়েমানুষের দোষ আছে। মাঝে মধ্যে তার কাছে চাঁপা বলে একটি মেয়ে আসে, তখন আমাকে কিছুক্ষণ বাইরে পায়চারি করতে হয়। এরকম ছোটখাটো সহযোগিতা আমি নিয়মিতই করে থাকি। আমি জানি, মেদিনীপুরের গাঁয়ে গোকুলের বউ আর ছেলেপুলে আছে। এবং সে এ বাড়ি থেকে বড় একটা ছুটি পায় না। গোকুল আমাকে মাঝে মাঝে বলে, মাস্টার, খারাপ কিছু ভেবনা কিন্তু। চাঁপাকে আমি বিয়ে করব।

সমাজে যে নানা স্তর আছে তা সকলেরই জানা। উপরের স্তরগুলো পুকুরের জলের মতো। স্বচ্ছ, পরিস্কার, অনেকটা গভীর অবধি দেখা যায়। কিন্তু তার নীচে ঘোলা, কাদা, অস্বচ্ছ। হিন্দু কোড বিল বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ইত্যাদি আইনকানুন অত তলা অবধি পৌঁছয় না। নীচের দিকে অর্থাৎ প্রদীপেরনীচে যে অন্ধকার সেখানে দু-তিনটে বিয়ে করা কোনও ব্যাপারই নয়। ওসব কেউ গায়ে মাখে না, মাথা ঘামায় না, মামলামোকাদ্দমাও হয় না। ডিভোর্সের বালাইও নেই। একে

অন্যকে ছেড়ে অন্যতরো কারও সঙ্গে চলে গেলেও কোনও বখেরা দেখা দেয় না। দিলেও আপসে মিটমাট হয়ে যায়। গোকুল এই মুক্ত সমাজের লোক। ঝামেলা দুটো বিয়ে নিয়ে নয়, ঝামেলা হল অঙ্কে। গোকুল এ বাড়িতে যা মাইনে পায় তা দিয়ে দেশের সংসার এবং যদি সত্যিই চাঁপাকে বিয়ে করে-তাহলে এদিককার সংসার চালাতে হলে অঙ্কে তুখোড় মাথা চাই। গোকুলকে আমি সে কথা বোঝানোর চেষ্টাও করেছি। কিন্তু গোকুল এখন মরিয়া, শুধু বলে, ওদেখা যাবেখন।

অঙ্ক গরিবের বন্ধু। হঠাৎ ফুলুরি বা ঠান্ডা পানীয় খেতে ইচ্ছে হলে, সিনেমা থিয়েটারে ঢুকে পড়ার আচমকা ঝোঁক চাপলে, একখানা ফুটপাথের জামা কেনার শখ হলে ওই অঙ্কই এসে পথ আটকে দাঁড়ায়। ঘাড়ে হাত রেখে বন্ধুর মতো সৎ পরামর্শ দিয়ে ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে আসে। অঙ্কই গরিবের মা-বাপ।

নদীয়ার শান্তিপুরে আমাদের একখানা বাড়ি ছিল। সামান্য দু'কাঠা জমিতে আমার গরিব বাপ বাড়িটা করেছিলেন অতি কষ্টে। দু'খানা পাকা ঘর, ওপরে টিন, একটুখানি উঠোনের মত ফালি জমি। বাবা মারা যাওয়ার পর আরও অভাবে পড়ে মা ঘর দু'খানা নবীন ঘোষকে ভাড়া দিল। পিছনের বারান্দার এক কোণে ছোট একখানা খুপড়িতে আমি আর মা কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকতাম। নবীন ঘোষ নেতাগোছের লোক। মায়ের আশা ছিল নবীন ঘোষ আমার কাজকর্মের কিছু সুবিধে করে দেবেন। কিন্তু দেখা গেল, আমাকে নিয়ে ভাববার সময় নবীন ঘোষের নেই। সে মহা ব্যস্ত পার্টি নিয়ে। কিছু দিনের মধ্যেই বাড়িতে পার্টির অফিস বসে গেল। ছ'মাসের মাথায় নবীন ঘোষ ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে বলল, এবাড়িতে আর ভাড়া কী! চালের ফুটো দিয়ে ঘরে জল পড়ে, দেওয়ালের পলেস্তারা খসে যাচ্ছে, এসব সারাতেই তো অনেক টাকা চলে গেল।

মা মিনমিন করে বলল, আমাদের তাহলে চলবে কি করে?

কারও কি দিন অচল হয় বউদি? ঠিক আছে, এমাসে অর্ধেক দিচ্ছি।

মা সাহস করে বলল, তাহলে বাসাটা ছেড়েই দিন না।

নবীন ঘোষ বিনয়টিনয় ঝেড়ে ফেলে বলল, ছাড়ব! কেন, দেশে আইন নেই? যখন-তখন ভাড়াটে তুলে দিলেই হল? তুলতে হলে মামলা করুন গে।

নবীন ঘোষের ভাবসাব দেখে আমরা প্রমাদ গুনলাম। এসব ভাবসাব একটা পূর্বাভাস, ঝড়ের সঙ্কেত।

আমি আর মা যে খুপড়িটায় থাকতাম তার মধ্যেই ঘরের একটা জানালা পড়েছে। জানালাটা বন্ধ থাকলেও নবীন গিন্নি যে মাঝে মাঝে জানালায় কান পেতে আমার আর মায়ের কথাবার্তা শোনে তা আমাদের জানা ছিল। তবু রাতে মা আমাকে

ফিসফিস করে বলল, আমি তো নবীনবাবুর মতলব ভাল বুঝছি না। ভাড়া বন্ধ করেছে, বাড়িও ছাড়বে না। বড্ড ভাবনা হচ্ছে বাবা।

ওকে ভাড়া দেওয়াই তো ভুল হয়েছে মা।

কী করব বাবা! ভাবলুম পার্টির লোক, অনেক ক্ষমতা, তোর একটা হিল্লে করে দিতে পারবে। একটা বলভরসাও তো, কিন্তু এখন দেখছি উল্টো

তখন আমার বয়স কম হলেও অঙ্কে মাথা সাফ। মাকে বললাম, বাড়ি এমনিতেও যাবে, ওমনিতেও যাবে। তুমি বরং নবীনবাবুকে বলো বাড়িটা কিনে নিতে। দাম পাবে না, কিন্তু যা পাবে তাই লাভ বলে ধরে নাও।

ও বাবা, ভিটে ছাড়ব? তাহলে যাব কোথায়? খাব কি?

এই জ্বলন্ত প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না।

মায়ের তাগিদে কয়েক দিন পরে আমি ব্রজ উকিলের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বাবার সঙ্গে চেনাজানা ছিল, সেই সুবাদেই যাওয়া। চেম্বারের পর ব্রজজ্যাঠা বসে দলিলটলিল কিছু দেখছিলেন। আমার কাছে সব শুনে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বললেন, মামলা করতে চাস? তার খরচা দিবি কোত্থেকে? দেওয়ানি মামলা, বহুদিন চলবে। তারপর ধর মামলায় জিতলি, ডিক্রি পেয়ে আদালতের পেয়াদা নিয়ে এলি নবীনকে উচ্ছেদ করতে। নবীনের পার্টির ছোকরারা হুড়ো দিয়ে পেয়াদাদের তাড়াল। তখন! তাহলে?

ওভাবে পারবি না। বরং নবীনের উল্টো পার্টির লোক বিজন রায়কে গিয়ে ধর। শঠে শঠ্যং।

গেলাম। কিন্তু বিজন রায় মুখ বিকৃত করে বললেন, এসব ব্যাপারে আমি কী করব বলো তো! ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ কি আমার কাজ? সামনে ভোট, নবীনের সঙ্গে ঝামেলা পাকালে মুশকিল হবে। বরং দিলুকে গিয়ে ধরো, সে যদি কিছু করতে পারে।

দিলু বিজনবাবুর গুন্ডা। তার কাছেও গেলাম। সে উদাস গলায় বলল, কাজ হয়ে যাবে। তবে খরচাও আছে। পাঁচশো টাকা আগে ছাড়। পাঁচশো?

ওটা অ্যাডভান্স। পরে আরও লাগবে। সোজা কিচাইন তো নয় রে।

অত টাকা কোথায় পাব?

তাহলে আমার কাছে এসেছিস কেন? তোর কি সুন্দরী বোনফোন আছে নাকি? তাহলেও না হয় কথা ছিল। ভুখখা পার্টির কাজে আমি নেই। যা, ফোট।

ফুটলাম। সুন্দরী না হলেও আমার একটা দিদি আছে। বাবাই তার বিয়ে দিয়ে গেছেন। কোন্নগরে। সেই দিদি খুব সুখে নেই। বিয়ের পর একবার কী দুবার সংসার খরচের টাকা থেকে সরিয়ে মাকে কিছু টাকা পাঠিয়েছিল। জামাইবাবু জানতে পেরে বেদম পেটায়। তার পর থেকে সম্পর্ক নেই। মাঝে মধ্যে এক-আধটা পোস্টকার্ড

আসে বটে, কিন্তু মা ভয়ে তার জবাব দেয় না। যদি জামাইবাবু তুচ্ছ চিঠির ছুতো ধরে ফের অশান্তি করে।

এই ঘটনার পর অবশ্য আমি একটা সুরাহার আশায় দিদির কাছে একদিন যাই। দিদি আমাকে দেখেই আতঙ্কিত, ওরে বাবা! তুই এসেছিস! কী সর্বনাশ! জানতে পারলে কী যে হবে!

আমি সংক্ষেপে বাড়ির সমস্যার কথা বলায় দিদি মাথা নেড়ে বলল, ওসব নিয়ে আমার কি মাথা ঘামানোর সময় আছে? এখন যা। আমার ননদ টুসিটা যা পাজি! ঠিক দাদাকে বানিয়ে বলবে তোর হাত দিয়ে বাপের বাড়িতে টাকা পাচার করেছি। যা ভাই, যা।

আমি চলে আসি।

মা মারা গেল আরও ছ'মাস বাদে। গরিবের শোকও খুব বেশি হয় না। মৃত্যু তার খুব চেনা বন্ধু।

মায়ের বাক্সপ্যাঁটরা ঘেঁটে সামান্যই পাওয়া গেল। তাই দিয়ে নমো নমো করে শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধরই বা কী দরকার ছিল কে জানে বাবা!

মা মারা যাওয়ার পর নবীন ঘোষ অবশ্য প্রথম প্রথম দুঃখটুঃখ প্রকাশ করল। এমন কী একথাও বলল যে, মা নাকি খুবই ভাল লোক ছিল।

কিছুদিন পর নবীন আমাকে বলল, এইবার তোমার পিছুটান ছিঁড়ে গেল, মুক্ত হয়ে গেলে। এবার ভেসে পড়, ভেসে পড়। এই জায়গায় মুখ গুঁজে পড়ে থেকে জীবনটা নষ্ট করবে কেন হে? চারদিকে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র। বেরিয়ে পড়, কলকাতা যাও, হিল্লিদিল্লি চলে যাও, জীবনটাকে ঘুরেফিরে দেখ, নিজের দু'পায়ে দাঁড়াও। বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র পড়ে আছে চারদিকে।

তারপর থেকেই নবীন ঘোষ আমাকে রীতিমতো বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রের দিকে ঠেলতে লাগল। এ ব্যাপারে তার বউ আর পার্টির ছেলেরাও যথেষ্ট উৎসাহ দেখাতে লাগল। পার্টির বিজু নামে একটা ছেলে এক সময়ে আমার বন্ধু ছিল। সে একদিন আমাকে রাস্তায় ধরে বলল, দু'কাঠা জমি আর ওই বড়িটুকুর জন্য নবীন ঘোষ তোদের সঙ্গে যা করছে তাতে লোকটাকে ঘেন্না হয়। লোকটার মতো বদমাশ দুটো দেখিনি। একদিন যখন সময় আসবে তখন ওর পাছায় দুটো লাথি মারব। কিন্তু ওর মতলব ভাল নয়। তুই একটু গা ঢাকা দে।

কেন রে? মারবে নাকি?

বিজু একটু গলা খাটো করে বলল, মতলব তাই। গোপনে কুঞ্জ সাপুড়ের কাছে গিয়েছিল। শালা জানে না, এক সময়ে আমি কুঞ্জদার সাকরেদি করেছি।

কুঞ্জ সাপুড়ে! তার কাছে কেন?

তোর ঘরে সাপ ছাড়ার মতলব। কুঞ্জদাই আমাকে ঠারেঠোরে বলেছে।

সেই রাতে আর ঘুম হল না। ঘরে সারা রাত টেমি জ্বেলে বসে রইলাম।

পরদিনই বিজু এল। বাড়ি থেকে আমাকে বের করে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে বলল, তোর জন্য একটা ব্যবস্থা করেছি। কী ব্যবস্থা?

আমার বাবার একজন মক্কেল আছে কলকাতায়। মস্ত বাড়ি। তার বাড়িতে তোর একটা থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বিজুর বাবা তান্ত্রিক এবং জ্যোতিষী। একটু নাম-ডাকও আছে। বিজু যে এই দুঃসময়ে আমার জন্য ভাবছে এতেই বুকটা ভরে গেল।

বিজু হাতে একখানা মুখ-আঁটা খাম দিয়ে বলল, তোর বাড়ি যাতে ওই কুমিরের হাতে না যায় সেটা আমি দেখব।

আমি বললাম, গোটা বাড়িটা তো ওরই গরাস হয়ে আছে। অন্তত খুপরিটা যাতে বাঁচে।

বাঁচবে। পার্টির ছেলেদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অন্যায়টা সবাই মেনে নিতে চাইছে না। সেসব পরে হবে। আগে তো জান বাঁচা।

সেই জান বাঁচাতেই কলকাতায় আসা।

ভাদ্র মাস। শেয়ালদায় নেমে একটু আতান্তরেই পড়েছিলাম। কলকাতায় দুই-একবার আসা ছিল বটে, কিন্তু সড়গড় হয়নি। তবে শোনা ছিল মধুসূদনবাবুর বাড়ি শেয়ালদা থেকে হাঁটাপথ। যখন বাড়ির সামনে পৌঁছলাম তখন একটা ভরসা হল। পুরনো আমলের বেশ বড় দোতলা বাড়ি। চারদিকে পাঁচিল ঘেরা একটু জমিও আছে, গাছপালাও দেখা যাচ্ছিল। সামনে বড় ফটক। সেটা বন্ধ। তবে বড় ফটকের গায়ে একখানা ছোট ফটকও আছে, তা দিয়ে কোলকুঁজো হয়ে ঢুকে পড়া যায়। কিন্তু ঢোকা গেলেই তো আর ঢোকা যায় না। কে এসে ক্যাঁক করে চোর বলে ধরে তার ঠিক কি? তাই গাড়লের মত দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছি, হঠাৎ উল্টো দিকে একটা পানের দোকান থেকে একজন আধবুড়ো লোক হাঁক দিয়ে বলল, ও মশাই, কাকে চাইছেন?

ভয়ে ভয়ে বললাম, মধুসূদনবাবুর কি এই বাড়ি?

হ্যাঁ, কী দরকার!

আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি।

অ। কাজটা শক্ত হবে। বাবু এখন ব্যস্ত। তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

নদীয়ার শান্তিপুর থেকে।

খুব চিনি। বেড়ে জায়গা। আমার পিসতুতো শালা সেখানেই গাঁট গাঁট কাপড় গস্ত করতে যায়। তা কোন কাজে আসা? সঙ্গে বাক্স-বিছানা দেখছি যে! থাকার মতলব নাকি?

একটু দরকার ছিল।

দরকারেই সবাই আসে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি বাপু, মাধুবাবুর কিন্তু এখন সেই আগেকার দিন নেই যে, চাকরি টাকরি করে দেবেন বা দু-পাঁচশো টাকা সাহায্য দিয়ে বসবেন বা নিষ্কর্মা আত্মীয়স্বজনদের বসে বসে খাওয়াবেন। অবস্থা পড়তি।

বুঝেছি। সেসব নয়। একটা চিঠি দিতে আসা।

কার চিঠি?

শান্তিপুরের কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্যের। মাধুবাবু চেনেন।

তাহলে দাঁড়িয়ে থাকুন। বাবু এখন ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। এ সময়ে দিক করলে ভারি রেগে যাবেন। ওই যে কালো লেজওলা লাল ঘুড়িটা উড়ছে ওটা নজরে রাখুন।

ঘুড়ি বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা গভীর এবং ব্যাপক। আর কিছু তেমন না পারলেও ঘুড়িটা আমি ভালই ওড়াতাম। কাজেই ফুটপাথে বাক্স-বিছানা রেখে আমি হাঁ করে ঊর্দ্ধমুখ হয়ে মধুবাবুর ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে লাগলাম। যা দেখছিলাম তা অতি যাচ্ছেতাই। মাধুবাবু মোটেই ঘুড়ি ওড়াতে জানেন না। তাঁর ঘুড়ির কোনও হেলদোল নেই, কাম্নি নেই, লাট খাচ্ছে না। শুধু বেলুনের মতো ভেসে আছে। পুবদিক থেকে একখানা কালো হলুদ চাঁদিয়াল বেড়ে এল, ওপর থেকে গোঁত্তা খেয়ে নেমে একটানে মধুবাবুর গাড়ল লাল ঘুড়িটাকে ভো-কাট্টা করে দিল। আমি খুবই রেগে যাচ্ছিলাম; এরকম লোকের ঘুড়ি ওড়ানো সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়বার ফের মধুবাবুর ছাদ থেকে একই চেহারার লাল ঘুড়ি লাফঝাঁপ খেয়ে উড়ল এবং ওপরে উঠে ভালমানুষের মতো চুপটি করে ভেসে রইল। পশ্চিম দিক থেকে সাপের মতো একখানা কালো ঘুড়ি চমৎকার লাট খেতে খেতে ধেয়ে এল। কুচ করে লাল ঘুড়িটা কেটে মহানন্দে ওপরে উঠে গেল। মনে হল, মধুবাবুর তিনমাস সশ্রম কারাদন্ড হওয়া উচিত।

পর পর মোট তেরোখানা লাল ঘুড়ি আকাশগঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে মধুবাবু ক্ষান্ত হলেন। তেরোটা ঘুড়ির সুতো সমেত দাম কম নয়।গরিবের সংসারের একবেলার খরচা। মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেল। উত্তেজনার মাথায় ছোট্ট ফটকটা ঠেলে ঢুকেই পড়তে যাচ্ছিলাম, পানের দোকানদার হাঁক মেরে বলল, করেন কি, করেন কি, করেন কি মশাই? পাগল নাকি? বাবু এখন ঘেমেটেমে নামবেন, বড় ঘরের পাখার তলায় বসে ঘাম শুকোবেন, তারপর ঠান্ডা সরবত খাবেন। আরও আধ ঘন্টা ধরে রাখুন।

সরবত! এরকম বিচ্ছিরি ঘুড়ি যে ওড়ায় তার বিষ খাওয়া উচিত। সামনে পেলে মধুবাবুকে হয়ত কথাটা বলেই ফেলতাম। ভাদ্র মাসের চড়া রোদে বেলা বারোটায় ঘন্টাখানেক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ঘুড়ির প্রহসন দেখলে লঘুগুরু জ্ঞান থাকার কথা নয়।

অনেক কথাই দেখেছি, সময়মতো বলে না ফেললে আর বলা হয় না। সময়ের ফাঁক পড়লেই নানারকম বুদ্ধি-বিবেচনা এসে যায়।

আধ ঘন্টা বাদে পানওলা একটু সদয় হয়ে বলল, এইবার যান ঢুকে পড়ুন। কুটুম মানুষ রোদে অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি কুটুম নই, কিন্তু গাড়লের মতো কথাটা কবুল করতে যাই কেন? ফটক দিয়ে ঢুকে লাল সুরকির পথ দিয়ে গাছপালার ছায়ায় কয়েক কদম হাঁটলেই গাড়িবারান্দা। বাক্স-বিছানা গাড়িবারান্দার একখানা থামের আড়ালে রেখে ভিতরে ঢুকলাম। ফের বলি, আমি গাড়ল নই যে, বাক্স-বিছানা মধুবাবুর সামনে উদয় হব. এমনিতেই মানুষ উটকো লোক পছন্দ করে না। বাক্স-বিছানা সমেত হলে আরও অপছন্দ করে।

দরজার মুখে চাকর পথ আটকাল, কী চাই?

শান্তিপুর থেকে আসছি। কোকিলেশ্বরবাবুর চিঠি আছে। মধুসূদনবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

কই চিঠি, দেখি?

চিঠি নিয়ে সে ভিতরে গেল।

খানিকবাদে এসে বিরস মুখে বলল, ভিতরে এস।

তান্ত্রিকটান্ত্রিককে সবাই ভয় খায়, খাতির টাতির করে। ভেবেছিলাম কোকিলেশ্বরের চিঠি পেয়ে বাবু নরম হয়ে থাকবেন। নরম হলে আর কাত হতে কতক্ষণ?

বনেদি বড়লোকদের বাড়ি যেমন হয় মধুবাবুর বাড়িও সেইরকম। দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং, মেঝেতে মার্বেল, ঝাড়বাতি, বার্মা সেগুনের সাবেক আসবাব। দুখানা ঘর পেরিয়ে তিন নম্বর ঘরে মধুবাবু একখানা ভারী আরামকেদারায় বসা। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো বয়স। নাদুসনুদুস ফর্সা চেহারা, টানা টানা চোখ। ওপরে পাখা ঘুরছে, তবু দড়দড় করে ঘাম হচ্ছে। আমি সামনে যেতেই হঠাৎ টানটান হয়ে বসে বাঘা গলায় হাঁক মারলেন, ভেবেছে কি। জোচ্চোরটা? আমার বাড়িটা হলেও বুঝতুম! ব্যাটা তিন দফা হাজার টাকা করে নিয়ে তিনটে মাদুলি দিয়েছে, বলেছিল মামলামোকাদ্দমা তিনমাসে মিটে যাবে। মাদুলির কি জোর রে বাবা, চারখানা মামলা ছিল, এখন দাঁড়িয়েছে সাতখানায়। আর সাত হাজার টাকা দিয়ে যজ্ঞ করালে, কি না একজিমা সারবে। সেরেছে একজিমা? এই দেখ-

মধুবাবু ধুতি তুলে ডান পাখানা বাড়িয়ে দিতেই দগদগে একজিমা দেখে আমি প্রমাদ গুনে চোখ বুজে ফেললাম।

জোচ্চোর! জোচ্চোর! চারশ বিশ। একটাও খাটি তান্ত্রিক আজ অবধি খুঁজে পেলাম না। বুঝলে! তার ওপর আবার চিঠি ঠেকানো হয়েছে, পেয়ারের লোককে কলকাতার ঠাঁই করে দিতে হবে! ওসব মনে করি। টাকাগুলো যদি ভালোয় ভালোয় ফেরত না দেয় তো আমি থানা-পুলিশ করব।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, যে আজ্ঞে।

কথা শেষ করে বাবু উঠতে যাচ্ছিলেন। আমার মুখের ওপর দরজা একরকম বন্ধই হয়ে গেল বলা যায়। আর দরজা যখন বন্ধই হচ্ছে তখন আমার পেটের মধ্যে যে কথাগুলো আঁকুপাকু করছিল সেগুলোকে চেপে রাখার কোনও মানেই হয় না। আমি গলাখাঁকারি দিয়ে বললাম, বাবু একটা কথা ছিল।

না না, কোনও কথা নয়, কেটে পড়।

আমি বললাম, ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে দু-একটা কথা টক করে বলে যাই। মধুবাবু থমকে ভ্রূ-কুঁচকে বললেন, ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে কী কথা?

আপনার মোট তেরোটা ঘুড়ি আজ কাটা গেছে। সঙ্গে অনেকটা করে সুতো। ঘুড়ির দাম দেড়-দু টাকা করে ধরলেও ত্রিশ-চল্লিশ টাকার ধাক্কা।

বাবু গরম হয়ে বললেন, দেড়-দু টাকা! ছোঃ। ওসব আবার ঘুড়ি নাকি? এ হল ইসমাইলের ঘুড়ি, এক একখানা বারো টাকা করে দাম।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হিসেব কষে বলে দিলাম, তাহলে গত দেড় ঘন্টায় আপনার একশো ছাপান্ন টাকার ঘুড়ি কাটা গেছে। সুতো আর মাঞ্জার খরচ ধরলে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা।

বাবু নরম হলেন। একটু লজ্জাও পেলেন মনে হল। মাথা চুলকে বললেন, ইয়ে, তা বিকেলেও আমি ঘন্টাখানেক ঘুড়ি ওড়াই।

আমি আঁৎকে উঠে বললাম, বলেন কি? তাহলে যে দিনে পাল্লাটা চারশো টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে? তার ওপর আপনি একটা ঘুড়িও কাটতে পারেন না ঘুড়ি ওড়ানোর কিছুই আপনি জানেন না।

বাবুকে এবার একটু আগ্রহী দেখাল, তুমি জান বুঝি?

জানি মানে? ঘুড়ি অ আ ক খ থেকে বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত সব।

বাবুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হল, জান? কি জান?

আমি গলাখাঁকারি দিয়ে ঘুড়ি বিষয়ে আমার জ্ঞান উজার করে দিতে লাগলাম। লাটাইয়ের রকমফের, সুতো, বিভিন্ন মাঞ্জা, হরেক রকমের ঘুড়ি, এবং ওড়ানোর নানা কায়দা, ঘুড়ি কাটার নানা কৌশল। আমি বলে যাচ্ছি আর বাবু দেখলাম চোখ

বুজে মাথা নেড়ে নেড়ে তারিফ করছেন, ঠিক যেমন সমঝদাররা ওস্তাদি গান শুনে তারিফ করে। প্রায় চল্লিশ মিনিট ভাষন দেওয়ার পর আমি বললাম, এ হল হাতে খড়ি, এসব হাতেকলমে না শেখালে শেখা কঠিন। তবে সাদামাটা হিসেব হল, আপনি যদি এক এক বেলায় চার-পাঁচটা করে ঘুড়ি কাটতে পারেন তাহলে আপনার আট দশটা করে ঘুড়ির খরচ বেঁচে যাচ্ছে। তার মানে দিনে প্রায় একশ সোয়া শ টাকা।

বাবু চোখ খুলে হাঁক দিলেন, গোকুল!

চাকরটি এসেই হাজির হতেই বললেন, তোর ঘরে একটা চৌকি পেতে দে। আজ থেকে এ এ-বাড়িতেই থাকবে। গোকুলের মুখটা একটু শুকনো দেখাল। শুকনো গলাতেই বলল, যে আজ্ঞে।

কলকাতায় এটা আমার প্রথম দিগ্বিজয়।

মধুবাবু একদিন আমাকে ডেকে বললেন, আচ্ছা, অঙ্কে তো তুমি বেশ ভালোই।

আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, যে আজ্ঞে। মাধ্যমিকে আমি অঙ্কে ষাট পেয়েছিলাম।

একথায় মধুবাবুর চোখে মুখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। বুঝলাম উনি মাধ্যমিকে অঙ্কে অত নম্বর পাননি। উনি বেশ সম্ভ্রমসূচক গলায় বললেন, সেদিন তুমি ঘুড়ির হিসেব বোঝাতে গিয়ে যেভাবে বারোর সঙ্গে তেরো গুন করে ফেললে তা বেশ কঠিন কাজ। তুমি বরং আমার ছেলেটাকে অঙ্ক শেখাও। তার অবশ্য অঙ্কের মাস্টার আছে, তবে সে সপ্তাহে দুদিন করে আসে। তুমি রোজ সন্ধেবেলা বসে ওর হোমটাস্কগুলো দেখে দিও।

যে আজ্ঞে।

।। দুই ।।

মধুরিমা

মানুষের মনের মধ্যে এক অন্য জগৎ। ভাগ্যিস সেই জগতের কথা অন্য কেউ টের পায় না। পেলে আমার খুব মুশকিল ছিল। মনের মধ্যে কত কী যে হয়, কত খারাপ খারাপ কথা আসে, কত খারাপ চিন্তা, কত পাপ, কত লজ্জা যে বলতে পারি না। মনের জ্বালায় জ্বলে মরি। আর একা একা কত যে হাসি, কাঁদি, বিষন্ন হয়ে যাই তার ঠিক নেই। আশেপাশে কোনও অর্ন্তযামী নেই বলেই বেঁচে গেছি বাবা।

গঙ্গা একদিন বলেছিল, তোর চোখে ভাষা আছে।

আমি হেসে মরি। চোখ কি ডায়লোগ দেয় নাকি রে পাগল!

গঙ্গা বলল, তা নয়। তোর মনের ভাব চোখে বেশ ফুটে ওঠে।

তাই? তাহলে বলতো আমি এখন কী ভাবছি!

তা বলতে পারব না। কিন্তু মাঝে মাঝে তুই যখন আমাকে ঘেন্না করিস তখন টের পাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, ওমা! তোকে আবার কখন ঘেন্না করলুম?

গঙ্গা তার উঁচুনিচু বিচ্ছিরি দাঁতে হেসে বলল, সব সময় নয়, মাঝে মাঝে করিস কিন্তু। আমি টের পাই।

বিপদ হল, এই টের পাওয়াটা ভাল লক্ষণ নয়। কথাটা মিথ্যে হলে বাঁচতুম, কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। গঙ্গা-কে জানে কেন-আমার ভীষণ ন্যাওটা। বন্ধু কিন্তু বন্ধুর মত নয়। আমি যা বলি, যা করি, গঙ্গা তাতেই মুগ্ধ। আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে সবসময়ে। বাড়ি গিয়ে সারাক্ষণ নাকি আমার কথাই বলে। ওর এই ন্যাওটাপনায় মাঝে মাঝে আমার হাঁফ ধরে যায়। এত অদেখলেপনা কেন রে বাপু? আর সারাক্ষণ আমার মুখের ওপর আমার অত প্রশংসা কেন? এমনিতে ভালই লাগে, কিন্তু সারাক্ষণ নয় তা বলে!

আমি অত ভালও কিছু নই। দেখতে বেশ সাদামাটা, লেখাপড়ায় মাঝারি, গরিবের মেয়ে এবং আহ্মরি ও বুদ্ধিমতিও কিছু নই। গঙ্গা আমার চেয়ে উনিশ-বিশ খারাপ। সে দেখতে আর বুদ্ধিশুদ্ধিতে একটু খারাপ। কিন্তু পাল্লায় তুললে খুব বেশি পার্থক্য নেই। একটা ব্যাপারে সে আমার চেয়ে এগিয়ে আছে, সেটা হল পয়সা। তার বাবার অনেক টাকা। অনেক অনেক টাকা।

বিপদ হল, এই যে সত্যিই আমি গঙ্গাকে মাঝে মাঝে ঘেন্না করি এটা ও টের পাচ্ছে। কী করে পাচ্ছে কে জানে। আমার চোখ নাকি ডায়ালগ দেয়। গঙ্গাকে নিয়ে আমার চিন্তা নেই। সমস্যা অন্য জায়গায়। বোকা গঙ্গাও যদি আমার মনের কথা একটু হলেও জেনে যায় তাহলে অন্য কেউ-আরও বুদ্ধিওলা কেউ তো আরও বেশি টের পাবে।

এমনিতে গঙ্গা আর আমি খুব বন্ধু।

পাড়ার নবকুমারী রেপ হওয়ার পর অনেক মিটিং টিটিং হল। ভীষণ উত্তেজনা। সকলেই এই সামাজিক অপরাধের প্রতিকার নিয়ে ভাবিত।

প্রতিকার নিয়ে ভেবে যে কিছু হয় না তা আমরা-মেয়েরা খুব ভাল জানি। এই মেয়ে-শরীর যতদিন থাকবে পৃথিবীতে রেপও থাকবে। দোষের মধ্যে নবকুমারী একটু বারমুখো, একটু উড়নচণ্ডী ছিল। কবে রেপ হবে সেই ভয়ে তো আর সবাই গুটিয়ে থাকতে পারে না। আর সব মেয়েই যে রেপকে ভয় পায় এমনও নয়। শীতকালে সুবর্ণরেখার ধারে পাড়ার এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের সঙ্গে লরিতে চেপে ঘাটকে হিন্দি গান বাজাতে বাজাতে তারা বনভোজনে গিয়েছিল। সেইখানে কী হয়েছিল তা কে বলতে পারে! সুবর্ণরেখার ধারে তখন আরও পঞ্চাশটা দল পিকনিক

করতে এসেছে। এদলে ওদলে মেলামেশা হতেই পারে, ঝগড়া কাজিয়া মারপিটও হয়। নবকুমারী একটু বেসামাল আর দলছুট হয়ে গিয়ে থাকবে। ফেরার সময়ে মাথা গুনতির সময় তাকে না পাওয়ায় খোঁজ খোঁজ। মাঝরাত্তিরে অচৈতন্য তাকে পাওয়া গিয়েছিল ঝোপজঙ্গলের মধ্যে।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, মেয়ের বাড়ির লোকেরা ঘটনাটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল, পুলিশ দার্শনিকের ভূমিকা নিয়ে মেয়েটারই দোষ খুঁজে বের করতে লাগল, এরকম ক্ষেত্রে এসব তো হতেই পারে। বেশি অ্যাডভেনচারাস হওয়াটা মোটেই ভাল নয়। আর নবকুমারী একদম চুপ মেরে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল। রেপিস্টরা ধরা পড়ল না। কারণ অতগুলো দল পিকনিক করতে গিয়েছিল, কোন দলের কোন কোন ছেলেরা কান্ডটা করেছিল তা নবকুমারীর জবানী থেকে স্পষ্ট হল না।

রেপিস্ট কথাটা আমার পছন্দ নয়। ফেমিনিস্ট, আইডিয়ালিস্ট ইত্যাদি শব্দের পিছনে একটা ইজম থাকে। রেপের পেছনে তো আর রেপিজম নেই, রেপ যে করে তাকে রেপার বললেই তো হয়। ইংরেজি ভাষা কিছু কিম্ভূত আছে কিন্তু।

যাই হোক, নবকুমারীর ঘটনার পর থেকে আমাদের পাড়ায় রেপ প্রতিরোধের নানা প্রতিষেধকের কথা উঠল, অতনুদা হলেন পাড়ার ডু-গুডার। তিনি মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য কারাটে ক্লাসের ব্যবস্থা করলেন। একজন অল্পবয়সী কারাটে বিশেষজ্ঞ অমর স্মৃতি ক্লাবের ছোট্ট উঠানে সপ্তাহে দুদিন আমাদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখাতে লাগল। হাত ওঠানো, পা ওঠানো, এক ঠ্যাঙে নেংচে নেংচে শূন্যে লাথি মারা এসব করতে গিয়ে আমরা হেসে কুটিপাটি, তার ওপর অনভ্যাসে গায়ে হাতে পায়ে একশো ফোড়ার ব্যথা। আর সেই কারাটে ক্লাস দেখতে পাড়ার গুচ্ছের ছেলেছোকরা জুটতে লাগল। তাদের উৎসাহই বেশি। আমাদের মধ্যে একমাত্র গঙ্গাই খুব মন দিয়ে শিখত।

আমি একদিন গঙ্গাকে বললাম, কারাটে শিখে হবে তো সাড়ে বাইশ। আমি আর লোক হাসাতে যাচ্ছি না বাপু।

গঙ্গাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও তাহলে আর যাব না।

ঠিক এইজন্য গঙ্গাকে আমার ঘেন্না হয়। কেন যে ও আমাকে প্রতিপদে নকল করে, আমার ভারি রাগ হয়।

গঙ্গা অবশ্য দুঃখ করে বলল, আর আমি যা কুচ্ছিত দেখতে, কেউ আমাকে রেপও করবে না।

কথাটার প্রতিবাদ করে গঙ্গাকে আমার সান্ত্বনা দেওয়া উচিৎ ছিল। সেটা আমি ইচ্ছে করেই করিনি।

কারাটে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করার সপ্তাখানেক বাদেই আমাদের লেটার বক্সে আমার নামে একটা চিঠি পাওয়া গেল: কারাটে ক্লাসে কেন আসছেন না? আমি যে আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকি, নীচে নাম সই-সুজিত।

খুব অখাদ্য না হলে সব মেয়েই কম বেশি প্রেমপত্র পায়, আমিও পেয়েছি কিন্তু এই চিঠিটা আমার বেশ পছন্দ হল। ভাবাবেগ নেই, উচ্ছ্বাস নেই। সুন্দর হাতের লেখায় দেড় লাইনে যা লেখার সবটুকুই লিখেছে। মুশকিল হল সুজিত যে কে আমি চিনলাম না। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে সুজিত বলে কেউ নেই। সুজিত ঘোষ একজন আছেন বটে, তাঁর বয়স সত্তরের ওপর তাহলে এ সুজিত কে?

গঙ্গার সঙ্গে আমার সব কথাই হয়। চিঠিটা দেখে সে খুব খুশি। আমার প্রেমপত্র এলেও সে যে কেন খুশি হয় কে জানে বাবা! গদগদ গলায় সে বলল, তোকে সকলের পছন্দ জানিস! সবাই তোর কথা বলে।

ডাহা মিথ্যে, তবু প্রতিবাদ না করে বললাম, কিন্তু ছেলেটা কে?

দাঁড়া, খোঁজ নিচ্ছি।

বেশি হইচই করিস না। মনে হচ্ছে পাড়ার নতুন কেউ। হইচই হলে ছেলেটার বিপদ হতে পারে। নবকুমারীর রেপ-এর পর পাড়া এখন গরম হয়ে আছে।

পরদিনই গঙ্গা এসে বড় বড় চোখ করে বলল, উরে বাবা এ যে সাজ্ঘাতিক ছেলে!

ভয় পেয়ে বললাম, সাজ্ঘাতিক!

হাঁ রে। এস টেক পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। শিগগিরই নাকি কানাডায় চলে যাবে।

কিন্তু ছেলেটা কে?

শেফালী বউদির ভাই। পরীক্ষা দিয়ে ছুটিতে দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। বোকারোর ছেলে।

একটু অবাক হলাম। এত ভাল ছেলের আমাকে পছন্দ কেন? অঙ্কটা মিলছে না। আমি রোমান্টিক ধরনের মেয়ে নই। বাস্তববুদ্ধি কাজ করে। আচমকা অনেক সময় একটা বাজে পছন্দ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরে তার জেরটা ভালই হয় না।

দেখতে কেমন?

দেখতে! বলে গঙ্গা একটু ভাবল। তোর পাশে মানাবে না। রোগা, হ্যাংলা শরীর, কালো। মুখে ব্রনর দাগ আছে।

আমি মৃদু হেসে বললাম, আমার মা কি বলে জানিস? ছেলেরা হল হিরের আংটি, একটু বাঁকা হলেও হিরে।

সে আমার মাও বলে। কিন্তু বর একটু সুন্দর না হলে ভাল লাগে, বল?

আমি হেসে কুটিপাটি, এর মধ্যে আবার বরের কথা আনতে গেলি কেন? একটা দেড় লাইনের চিঠি তা থেকে কি এত দূর ভেবে নেওয়া যায়?

তুই ভাই, বড্ড কাঠ-কাঠ। কোনও ছেলেকেই পাত্তা দিতে চাস না। আমি হলে-

তুই হলে?

একটু বাজিয়ে দেখতুম কিন্তু।

চিঠিটাকে বিশেষ পাত্তা না দিলেও আমি কিন্তু ফের কারাটে ক্লাসে যাওয়া শুরু করলাম। দুর্নিবার কৌতূহলও মেয়েদের একটা গয়না।

কারাটে ক্লাস যে একটা পন্ড শ্রম, এসব শিখেও যে শেষ অবধি ধর্ষণকারীদের ঠেকানো যাবেনা, এটা বুঝতে আমার সময় লাগেনি। কিন্তু অনেক মেয়েই নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শিখছে। তাদের অধিকাংশই হয়তো রেপ হবে না, কিছু অত্যাচারী ভাবী স্বামীদের কথাও হয়তো তাদের খেয়ালে রাখছে। কোন বাংলা ছবিতে যেন দেখেছিলাম নতুন বউ শাশুড়ির মার ঠেকাতে গিয়ে হাত মুচড়ে দিয়েছিল। মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে কত কী হয়। কিন্তু মুষ্ঠিযোগ জানা থাকা ভাল কিন্তু সুখী দাম্পত্য জীবনে কারাটের অবদান বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে।

তিনদিনের দিন সুজিতকে চিনতে পারলাম। গঙ্গা যেমন বিবরণ দিয়েছিল অনেকটা সেরকম দেখতে একটা ছেলে উঠোনের বাঁশের বেড়ার ধারে কয়েকজনের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তেই দেখা। গঙ্গা তাকে দেখেনি, সে মনপ্রান দিয়ে কারাটে শিখে যাচ্ছে।

একটু ফাঁক পেয়েই বললাম, ওটাই সেই সুজিত নাকি রে?

গঙ্গা আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোকে গিলে খাচ্ছে।

কলকাতা শহরে নিরবচ্ছিন্ন বাড়ি আর জনস্রোতে রোমান্টিক ফাঁকা জায়গা নেই বললেই হয়। ক্লাসের শেষে আমি আর গঙ্গা যখন বাড়ি ফিরছি তখন একটা সদ্য ওঠা বাড়ির সামনে সুজিতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি গঙ্গার হাত টেনে ধরে দাঁড়িয়ে বললাম, কিছু বলবেন?

সুজিত বেশ লাজুক। কুণ্ঠিত গলায় বলল, আমি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। কোনও অন্যায় হয়নি তো!

চিঠি দেওয়াটা তো অন্যায় নয়। অসভ্যতা করাটা অন্যায়।

গঙ্গা আমার হাত খিমচে দিচ্ছিল।

সুজিত মাথা নিচু করে নরম গলায় বলল, আপনার মনোভাবটা যদি জানতে পারতাম!

অনিচ্ছে সত্ত্বেও যে কারাটে ক্লাসে আবার আসছি তো তা থেকে মনোভাবটা বুঝে নিতে পারবেন। তবে একটা কথা।

কি কথা?

আমি তেমন দেখন-সুন্দরী মেয়ে নই। লেখাপড়াতেও ভাল না। দুদিন পরে আপনার ভুল ভাঙ্গলে আমি বিপদে পড়ব। আমি গরিবের মেয়ে, আমাদের অনেক হিসেব করে চলতে হয়।

আমি কিন্তু সিরিয়াস।

আমি আরও বেশি সিরিয়াস। জানেন তো পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বিপদ বেশি।

জানি। আপনি কি ফেমিনিষ্ট?

সবমেয়েই ফেমিনিষ্ট। যেমন সব পুরুষই শৌভিনিস্ট।

আমি সেরকম নই।

শুনলাম আপনি ভাল ছাত্র, বিদেশে যাচ্ছেন।

সেটা আমার মাইনাস পয়েন্ট নয় তো!

না। তবে আমি একটু ভয় পাচ্ছি।

গঙ্গা খিমিচিতে বোধহয় হাতে রক্ত বেরিয়ে গেল। খিমচি দিয়ে যে কী বোঝাতে চাইছে ও-ই জানে। বোকাটা!

সুজিত অসহায় গলায় বলল, ভয় পাচ্ছেন কেন? আমরাও বড়লোক নই। নিতান্তই মধ্যবিত্ত। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

মেয়েদের অসুবিধেগুলো পুরুষেরা কখনও বুঝতে পারে না। পুরুষরা যখন কোনও মেয়েকে চায় তখন জান-কবুল করে চায়, যা-খুশি করতে পারে। কিন্তু পুরুষের আবেগটা বেশিদিন থাকে না।

সুজিত এবার চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, আশ্চর্য! আপনার বয়স বোধহয় সতেরো-আঠারোর বেশি হবে না। এই বয়সে কোনও মেয়ের এত পারসোনালিটি থাকে না। প্রতিবাদ করছি না, কিন্তু একটা কথাবলি, মেয়েরাও যখন কোনও পুরুষকে চায় তখন তারাও কিন্তু কম মরিয়া হয়ে ওঠে না।

সত্যি কথা, তবে পারসেন্টেজে একটু কম।

আমাকে আপনার অপচ্ছন্দ হয়নি তো! আমি সুপুরুষ নই, কালো, রোগা, মুখশ্রী সুন্দর নয়।

আপনি বেশ লম্বা। পুরুষদের হাইটটাই তাদের রূপের প্রথম প্লাসপয়েন্ট। রোগাদের মোটাসোটা হওয়ার দরকারই বা কি, যখন সারা দুনিয়া রোগা হওয়ার জন্য পাগল! কালো রংটা কোনও আলচ্য বিষয় হতে পারে না।

যাক, বাঁচালেন।

আপনার কি চেহারা নিয়ে টেনশন ছিল? বেশির ভাগ পুরুষই চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায় না। পুরুষত্বটাই তো তাদের আসল চেহারা। আর একটা কথা।

কী কথা?

আপনার চেয়ে আমার এ ব্যাপারে কমপ্লেক্স অনেক বেশি, মেয়েদের রূপটা খুব বড় কথা। আমি দেখতে ভাল নই।

গঙ্গা চুপ করে থাকলেও এবার আর পারল না। আমার হাতে নখ বসিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, কি বলছিলি মুখপুড়ি? তুই দেখতে ভাল নোস তো ভাল কে?

সুজিত ফের একটু হেসে বলল, কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার অভ্যাস আমার নেই। জীবনে এই প্রথম কোনও মেয়ে সম্পর্কে প্রকাশ্যে আগ্রহ দেখালাম। এ ব্যাপারে আমার দিদিও সাক্ষী দিতে পারে যে মেয়েদের সম্পর্কে আমি খুব উদাসীন। আপনার যদি রূপগুন কিছুই না থেকে থাকে তাহলে আমি এতকালের অভ্যাস ভেঙে এতটা এগোতাম কি? আপনি প্রকৃত সুন্দরি কি না জানি না, কিন্তু আমি নিজের চোখ দিয়ে যা দেখছি তাই আমার যথেষ্ট।

ছেলেটাকে আমার বেশ ভাল লাগল। এতক্ষণ একটাও বোকা বোকা কথা বলেনি। ল্যালা নয়। বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে। বুদ্ধিমান পুরুষ সব মেয়েরই পছন্দ। তবে পছন্দ প্রেম এক জিনিস নয়। সুজিতকে প্রথম আলাপে আমার পছন্দ হলেও-অশ্চর্যের বিষয় আমার বুকে দুড়দুড়ুনি উঠল না, কান গরম হল না, জল তেষ্টা পেল না এবং সবচেয়ে বড় কথা লজ্জা-লজ্জা ভাবটাও এলো না। আর এগুলো যদি প্রথম দর্শনে না হয় তাহলে পরে আর কখনও হবে না। না, আমি এখনও প্রেমে পড়িনি।

এমন নয় যে, আমি প্রেমে খুব বিশ্বাসী। আমার ভেতরে একটা কাঠ-কাঠ ভাব আছে ঠিকই। গঙ্গা মিথ্যে বলে না। আমি বড্ড হিসেবি কিন্তু প্রেম না হলেও বিয়ে করতে তো নেই। আমার রক্ষনশীল পরিবার থেকেও আপত্তি উঠবে না, কারন সুজিতদা আমাদের সবর্ণ। আর সুজিতও প্রেম করার ছুতোয় কাছে ঘেষতে চাওয়ার ছেলে নয়। কানাডায় যাওয়ার আগে বিয়ে করে যেতে হবে বলে তার মা-বাবা ধরেছে। সে পরদিন আমাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবই দিয়ে ফেলল, তার দিদির মারফত। আমি রাজি থাকলে আমার মা-বাবার কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে।

আমি শেফালি বউদিকে বললাম আপনার ভাই এত অদ্ভুত কেন? ভাল করে দেখল না, বুঝল না, তার আগেই বিয়ের প্রস্তাব?

আমার ভাই এমনিতে খুব ভাল। যা করবে বলে ঠিক করে তাই করে। তোমার যদি আমদের পরবার সম্পর্কে কোনও দ্বিধা বা প্রশ্ন থাকে তাহলে বরং খোঁজ খবর করে দেখতে পার। গর্ব করে বলতে পারি আমার ভাইয়ের মতো ভাল ছেলে পাওয়া শক্ত।

সেটা জানি বউদি। আমার ভাবনা নিজেকে নিয়ে। আমি আপনার ভাইয়ের পাশে তো দাঁড়াতেই পারিনা। সবে মাধ্যমিক পাশ করেছি।

তুমিতো ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছ!

মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশনটা কোনও ব্যাপার নয়। গাদাগাদা ছেলে মেয়ে স্টার পেয়ে পাশ করেছে সেখানে আমার নম্বর মোটে সিক্সটি টু পারসেন্ট।

তুমি বরং একটু ভাব আমার বিশ্বাস এ বিয়ে হলে তোমার পরে কোনও অনুশোচনা করতে হবে না। আমার ভাই খুব গোছানো ছেলে।

নিজের জামা প্যান্ট নিজেই কেচে ইস্তিরি করে নেয়। সুন্দর বাজার করতে পারে। নিজের ঘরখানা ছবির গুছিয়ে রাখে। সংসারি ছেলে বলতে যা বোঝায়। ওর সঙ্গে যার বিয়ে হবে সে খুব সুখি হবে। আর একটা কথাও বলে রাখি, আমাদের কোনও দাবি দাওয়া নেই।

কে জানে এসব কথা শুনে আমার মনটা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছে সুজিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হলে আমার পরিশ্রম অনেক বেঁচে যাবে, দুঃচিন্তা করার কিছু থাকবে না। সুজিত হয়ত সময়মতো অফিসে যাবে, সময় মতো ফিরবে। নিজের জিনিস নিজে গোছাবে, আমার কাজে সাহায্য করবে। সবই ঠিক; কিন্তু আমার বাঙালী বাবা এ ধরনের পুরুষকে বলেন মাইগ্যা পুরুষ। তবু এ বিয়ের প্রস্তাব পেলে বাবা দু হাত তুলে নাচবে। শুধু আমার মনটাই নেচে উঠছে না। আমি মৃদুস্বরে বললাম, আমাকে দুদিন সময় দিন বউদি। এই বয়সে প্রথম বিয়ে প্রস্তাব তো ভেবে নিই।

ভাবো, তবে তোমার বয়স বলেই বলছি, বাড়ির গুরুজনদের বলো, তারা তোমাকে ভাবতে সাহায্য করবেন। তোমার মাত্র সতেরো-আঠেরো বছর বয়স, তোমার মাথায় হয়তো ঠিক কুলিয়ে উঠবে না।

আচ্ছা বউদি।

এর পর শুরু হল আমার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। এ বিয়ে করলে যে আমি জাগতিক দিক থেকে দারুন সুখী হব, আমার গরিব বাবা বিয়ের খরচ যে অনেক বেঁচে যাবে, বিদেশে থাকলে যে আমিও অনেক উন্নতি করতে পারব সে সবই আমি নিজেকে বোঝালাম। কিন্তু আমার নিথর বুকে কোনও তরঙ্গ নেই, উল্লাস নেই, আগ্রহটা অবধি জাগাতে পারছি না। কি যে করি! সুজিত কত ভদ্র ছেলে। কয়েকটা দিন সে আমার কাছে ঘেষার চেষ্টা অবধি করল না। বারবার হানা দিলে আমি বিরক্ত হতে পারি ভেবেই হয়তো। তিনদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করার পর মনে মনে বিপর্যস্ত হয়ে আমি মাকে সব বলে দিলাম।

সব শুনে মা প্রথমটায় কেমন যেন-যাকে বলে বিহ্বল হয়ে পড়ল। ঠোঁট নড়ছে, কথা সরছে না। তারপর আনন্দে আমাকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল, তোর যে এত ভাল পাত্র জুটবে তা যে স্বপ্নেও ভাবিনি!

আমার বাবা সামান্য একটা চাকরি করে। আর সকালে এক বড়লোকের বাড়ির গৃহদেবতার দৈনিক পুজো করে মাসান্তে সামান্য দক্ষিণা পায়। আর দুটোছাটা পুজো বা যজ্ঞ করে কিছু কিছু করে মাঝে মাঝে আসে। এই খবর শুনে বাবা স্তম্ভিত। বলল, এতকাল পুজো-আরচা করে এতদিন বাদে কি ভগবানের আসন টলল?

হঠাৎ দুপ্পড় ফুঁড়ে এক ঘড়া মোহর কে যেন ঢেলে দিয়ে দিয়েছে আমাদের ঘরে। যাই হোক, চিঠিচাপাটি চালাচালি, শেফালী বউদির মধ্যস্থতা ইত্যাদির মাধ্যমে বিয়েটা একরকম ঠিক হয়ে গেল। এখন ভাদ্র মাস। সামনে পুজো। আশ্বিন কার্তিকে বিয়ে হয় না। অগ্রহায়ণেও নয়, কারণ সুজিত তার মা-বাপের বড় ছেলে। পৌষ বাদ দিলে মাঘ মাসে বিয়ে হতে পারে। সুজিতের কাগজপত্রের প্রসেসিং চলছে, কানাডা যেতে যেতে মার্চ-এপ্রিল। বোকারো ফিরে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে আমার মাত্র দু-একবার দেখা হল। কথাবার্তা যৎসামান্য, কারণ সে লাজুক মানুষ, প্রেম নিবেদন করার মতো বোকা সে নয়। মা-বাবার তাকে বড্ড পছন্দ।

গঙ্গা জিজ্ঞেস করল, আপত্তিটা তাহলে কার?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, অপছন্দ! অপছন্দ তো কারও নয় দেখছি।

তবে তোর মুখখানা খুশিয়াল নয় কেন? আমার অমন পাত্র জুটলে ঢোল বাজিয়ে নাচতুম।

আহা, বিয়ে আবার অত আনন্দের কিছু নাকি? বিয়ে মানে হল ট্রানসপ্ল্যানটেশন তাই আমার নার্ভাস লাগছে।

তোকে নার্ভাস দেখাচ্ছে না। কেমন শুকিয়ে গেছিস। মুখে বড্ড করুণ করুণ ভাব।

গঙ্গা-বোকা গঙ্গা আমাকে মাঝে মাঝে ভয় পাইয়ে দেয়। ওকি করে আমার মনের ভাবটা টের পাচ্ছে? খুব বিপদ হল দেখছি। বোকা গঙ্গাই যদি টের পায় তাহলে চালাকরা তো আরও টের পাবে!

মনের মধ্যে এক অদ্ভুত গহীন রাজ্য। বাইরের কেউ টের পায় না সেখানে আমি কী! আমিও কি জানি? সেখানে আমি পাগল, আমি স্বৈরিনী, আরও কত কী!

ওই গহীন রাজ্যে নিজেকে আমি একদম চিনতে পারি না বাইরে যাকে ভালবাসি তাকে কখন যে ঘেন্না করি। আর যাকে ঘেন্না করি তাকে কেন যে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়; বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে দু-তিনজন সোলজার এসে আমাকে রেপ করুক। একদিন দুপুরে ঘুম থেকে উঠে

আমার মনে হল, আচ্ছা একটু গু খেলে কেমন হয়? খেয়ে দেখব কয়েক চামচ গু? ভাবতে ঘেন্না হচ্ছিল, কিন্তু ইচ্ছেটাও ছাড়ছিল না। এইসব উল্টোপাল্টা অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে আমার মন। মনকে আমি ভয়ও পাই আবার ভালওবাসি। ভালবাসি কারণ আমার বাইরের সাজানো জগৎটাকে ভেঙেচুরে সে নানা উত্তল অবতল আয়নায় নানা ছাঁদের প্রতিবিম্বে আমাকে দেখায়। এই যেমন আমার একদিন ইচ্ছে হল, আচ্ছা, আমার মা-বাবা এখন মরে গেলে কেমন হয়?

ওইখানে-ওই মনের রাজ্যে সুজিতের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয় না। তার কথা যদি-বা ভাবতে চেষ্টা করি মনটা একটু একটু বিষন্ন আর উদাস হয়ে যায়। কখনও বুক উদ্বেল হয় না, কামগ্রন্থিতে হয় না কোনও ক্ষরণও। আমার মনের মধ্যে একটা প্রত্যাখ্যান থানা গেড়ে বসে আছে। বসেই আছে। বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তাকে যতই উৎখাত করতে চেষ্টা করি না কেন সে স্থির নিশ্চল।

আর এইখানেই আমার ভয়। একদিন সুজিত ঠিক আমার চোখের ভিতরে সেই প্রত্যাখ্যানকে দেখতে পাবে। যেমন গঙ্গা ধরতে পারে। বোকা গঙ্গাই যদি পারে, বুদ্ধিমানসুজিত আরও সহজে পারবে।

অনেক ভেবে মনে হয় আমরা সবাই একটু একটু অর্ন্তযামী। মনের ভিতরটাকে বোধহয় সবসময়ে লুকোনো যায় না। তবে নানা মিথ্যে দিয়ে অভিনয় দিয়ে ধামাচাপা দেওয়া মাত্র। কিন্তু সে তো ভয়ঙ্কর পরিশ্রম!

একদিন আমাদের কারাটে ক্লাসে ধ্যান শেখানো হচ্ছিল। আমি আমাদের কারাটে মাস্টার সন্তদাকে জিজ্ঞেস করলাম ধ্যান করলে কি হয়?

মন একাগ্র হয়।

একাগ্র হলে কী হয়?

আমাদের মন তো নানা চিন্তায় ছড়িয়ে থাকে, একাগ্র হলে মন একটা চিন্তায় এসে স্থির হয়।

কোন চিন্তায় এসে স্থির হবে? ভাল চিন্তা না খারাপ চিন্তা?

না না, অবশ্যই ভাল চিন্তা।

তার কি কিছু ঠিক আছে? ভাল চিন্তা যদি মনে না আসে?

চেষ্টা করতে হবে। আর চেষ্টাই তো ধ্যান।

আচ্ছা ধরুন, ভাল চিন্তাই করলাম, তাতে কী হবে?

মনের শক্তি বেড়ে যাবে। টেনশন থাকবে না, ভয় থাকবে না।

টেনশন নয়। আমি জানতে চাই, ধ্যান করলে কি মানুষের প্রতি প্রেম ভালবাসা আসে?

এ কথায় সব কটা মেয়ে হেসে উঠল: হাসি মেয়েদের একটা রোগ।

সন্তুদা বললেন, আমি যত দূর জানি ধ্যান করলে সব কিছু পারা যায়। ওটা স্পষ্ট কথা হল না। আহা, করেই দেখ না।

ভাল না মন্দ জানি না আমি চোখ বুজে সুজিতকে ধ্যান করার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বুঝলাম সুজিতের মুখটাই আমার মনে পড়ছে না। তার বদলে অন্য সব নানা ধরনের মুখ চলে আসছে চোখের সামনে। আসছে নানা দৃশ্য। কিন্তু কিছুতেই সুজিতের মুখটা আসছে না।

এটা সত্যি যে আমি সুজিতের প্রেমে পড়িনি। এও সত্যি যে আমি প্রাণপ্রণে তার প্রেমে পড়ার চেষ্টা করছি। কিন্তু এত বায়নাক্কার দরকারটাই বা কী? আমার মা ও বাবার মধ্যে কোনও প্রেমট্রেম ছিল না। শুভদৃষ্টির সময়েই দুজনের প্রথম দেখা। তাতে তো কিছুই আটকায়নি। দুজনে দিব্যি মেখেজুখে আছে। একজন সৎ, ভাল ছেলে, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাকে ভালবাসা যাচ্ছে নাই বা কেন? উপরন্তু, যখন আমার আর কোনও প্রেমিক বা পছন্দের পুরুষ নেই! হ্যাঁ রে গঙ্গা, একটা সত্যি কথা বলবি? বল না।

এই যে আমার এতটা বয়স হল এর মধ্যে আমি কোনও ছেলের প্রেমে পড়লুম না কেন বল তো!

গঙ্গা ঠোঁট উল্টে বলল, তোর যোগ্য ছেলে আছে নাকি কেউ?

দুর! ওটা একদম বাজে কথা। আমি নিতান্তই সাদামাটা, আমি খুব ভাল জানি। এটা কোনও কথা নয়। আমি ভাবছি আমি কি প্রেমহীনা? তার মানে?

অনেক মানুষ থাকে হয়তো যারা কাউকেই ভালবাসতে পারে না।তাদের ওই ব্যাপারটাই ভগবান দেন না।

দুর! কী সব অলক্ষুণে কথা ভাবছিস! তোরমনটা কত নরম!

তুই আমার সব কিছু ভাল দেখিস সেই জন্য তোর সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই।

তোর হয়েছেটা কী? বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এখন এসব কথা কেন!

ভয় রে, আমি বড্ড ভয় পাচ্ছি। ভয়টা কিসের?

সুজিত তো অত ভাল ছেলে, কানাডায় যাবে, সব দিক দিয়ে রত্ন। আমার মতো খেঁদীপেঁচী ওর সামনে দাঁড়াতেই পারে না। তবু বল তো কেন আমি কিছুতেই ওর প্রেমে পড়তে পারছি না।

গঙ্গা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, দুর বোকা! তুই তো ওকে ভাল করে চিনিসই না। মেলামেশা, মাখামাখি যখন হবে তখন দেখবি প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিস।

মাথা নেড়ে বললাম, কিন্তু আমি যে আজ অবধি কোনও ছেলেরই প্রেমে পড়লুম না! অথচ এই তো প্রেমে পড়ার বয়স। সেই জন্য মনে হয় আমি বোধহয় বুকে পাথর নিয়ে জন্মেছি। তোর নিশ্চয়ই এমন হয় না?

না রে বোকা! আমার ওরকম হবে কি? আমি তো কুচ্ছিৎ, যে কোনও ছেলে দেখলেই প্রেমে পড়ে যাই। এমন কি ওই যে হলুদ বাড়ির সুধীর ঘোষ, যার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চেহারাটা সুন্দর বলে আমি একবার ওরও প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

আমি হেসে ফেললাম। গঙ্গা গম্ভীর হয়ে বলে, আমার তো বাছাবাছি করার উপায় নেই।

কথাটা ঠিক নয়। গঙ্গার রূপ না থাক, ওর বাবার প্রচুর টাকা আছে, বিয়ের বাজারে সেটাও মেয়েদের একটা প্লাস পয়েন্ট। গঙ্গা নিশ্চয়ই কাছাকাছি করতে পারে। আমার বিশ্বাস গঙ্গার বেশ ভাল বিয়ে হবে।

গঙ্গা বলল, আচ্ছা, তুই কখনও মনো রায়ের প্রেমে পড়িসনি?

আমি ঘেন্নায় শিউরে উঠে বললাম, মা গো! যা সাজে!

গঙ্গা হি হি করে হাসতে লাগল। বলল, কিন্তু চেহারাখানা বল! লোকে বলে মনো নাকি একদিন বোম্বে ফিলমের হিরো হবে।

তা হোক না হিরো। আমার ওরকম হিরোর দরকার নেই। যে ছেলে মুখে ফাউন্ডেশন মাখে, ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় সে আবার পুরুষনাকি? মেয়েছেলেরও অধম। তুই কি ওটার প্রেমে পড়েছিলি নাকি?

পড়ব না? কে না পড়েছে বল! তবে আমি কাছেই ঘেঁষতে পারিনি। আমাকে পাত্তাই বা দেবে কেন? ওর কত বান্ধবী।

বলতে নেই মনো রায় অতি সুপুরুষ। বেশ লম্বা-চওড়া, ফর্সা, মুখশ্রী দারুণ সুন্দর। আর এই অ্যাসেটকে কাজে লাগানোই হচ্ছে তার সারা দিনের একমাত্র কাজ। সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি বয়ঃসন্ধির মেয়েদের নিয়ে মনো রায় অলিতে-গলিতে ঘুরছে। চালপট্টি, রূপকথা স্টোর্সের পেছনের মাঠে, নার্সিং হোমের বাগানে। কিস খায়, চিঠি চালাচালি, সিনেমায় যাওয়া, রেস্তোরাঁয় খাওয়া। মনোকে পয়সা অবধি খরচ করতে হয় না। মেয়েরাই বাড়ি থেকে পয়সা এনে মনোর পিছনে খরচ করে, উপহার-টুপহারও দেয়। শাহরুখ খানের মতো চুল, মদির চক্ষু, লোলা হাসি, মুখে রূপটান, কখনও কারুকার্জ করা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবির সঙ্গে ডেনিম প্যান্ট, কখনও কুর্তা পাজামা, কখনও মারাত্মক টি-শার্ট আর শর্টস। মনো রায় যেন নিজেই নিজের বিজ্ঞাপন হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আমি বললাম, যে পুরুষের পুরুষ বন্ধু নেই তার পুরুষত্বও যাওয়ার মুখে। ও তো অর্ধেক মেয়েছেলে হয়ে গেছে।

গঙ্গা হি হি করে হাসল। তারপর বড় বড় চোখ করে বলল, মনো রায় না একবার কাকে যেন বলেছিল মধুরিমা সান্যালের খুব দেমাক। ওকে টিট না করতে পারলে আমার নাম পালটে রাখব। না?

সে তো সবাই জানে।

আর একবার বল না। সেই যে তুই ইস্কুল থেকে ফেরার পথে গলির মুখে তোর পথ আটকে কীসব ডায়ালগ দিয়েছিল।

বিরক্ত হয়ে বললাম আর কতবার শুনবি?

বল না, বল না।

সেটা কোনও বিরক্তের কাজ তো ছিল না। আমি শুধু মিষ্টি করে বলেছিলাম, এই যে মনোদেবী, আপনার বয়ফ্রেন্ড নেই কেন বলুন তো! হোমোসেক্সসুয়াল নাকি?

মুখখান কীরকম হয়ে গিয়েছিল বল!

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম খুব। আমি আর দাঁড়াইনি।

তোর যা সাহস!

আহা এ আর সাহসের কী?

আর কখনও ভেড়েনি তোর কাছে?

না। তবে একটা চিঠি দিয়েছিল। তাতে লিখেছিল যে খুব অনুতপ্ত, আসলে সে পাড়ার মেয়েদের সাথে মিশলেও কাউকেই তার পছন্দ নয়। একমাত্র আমিই নাকি তার ধ্যানজ্ঞান।

গঙ্গা চোখ বড় বড় করে বলল, তুই কী করলি?

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম।

তুই বলে পারলি। অন্য কোনও মেয়ে হলে চিঠিটা পড়ে পটকে যেত।

এমন হতেই পারে আমার ভিতরে প্রেমট্রেম বলে কোনও বস্তু নেই। না থাকলে বাঁচোয়া। প্রেম না থাকলেও আমার কিছু অসুবিধে নেই। সুজিতের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি ঠিকই একটা রফা করে নিতে পারব। প্রেম ছাড়াও তো কত সংসার দিব্যি টিকে আছে। প্রেমের বিকল্প আছে কাম, সংসার, দায়দায়িত্ব। আর এসবের ভিতর দিয়ে মেয়ে পুরুষের মধ্যে মায়ামমতা দায়দায়িত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিছু অসুবিধে হবে না, কিন্তু যদি এমন হয় যে আমার ভিতরে প্রেমটা ঘুমিয়ে আছে! ঠিক যেন মজবুত বাঁধে আটকানো শান্ত এক জলাধার। বাঁধ ভাঙার মতো কেউ যদি না আসে তাহলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বিয়ের পর কখনও যদি আমার সুখী সংসারের জীবনে হঠাৎ কেউ এমন আসে যে জলাধারের বাঁধ এক মুহূর্তে উড়িয়ে দিয়ে সব লন্ডভন্ড করে দেয়? শেষে কি নষ্ট নীড়ের চারুলতা হতে হবে আমাকে? ভগবান, তাহলে যে শ্যাম-কুল দুই-ই যাবে! তার চেয়ে প্রেম না থাকা ঢের ভাল।

সকাল বেলায় কে একজন বাইরে থেকে ডাকছিল, ঠাকুরমশাই আছেন নাকি? ঠাকুরমশাই?

আমি ঘুমচোখে উঠে দরজা খুললাম। বাইরে উদ্বিগ্ন মুখে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ধুতি, গায়ে একটা উড়ুনী।

বললাম, বাবার জ্বর, কী দরকার বলুন তো!

ছেলেটা খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, জ্বর! এঃ হেঃ, তাহলে তো মুশকিল হয়ে গেল।

কীসের মুশকিল? পুরুতের তো অভাব নেই, আর কাউকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নিন।

ছেলেটা বলল, আমি মধুসূদনবাবুর বাড়ি থেকে আসছি। ঠাকুরমশাই মধুবাবুদের বাড়ির লক্ষ্মী-নারায়নের নিত্য পুজো করেন কিনা!

জানি। গিয়ে বলুন অন্য কাউকে দিয়ে পুজোটা আজকের মতো চালিয়ে নিতে।

ছেলেটা খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, পুজো হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে! তাহলে তো মিটেই গেল।

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলল, না, মেটেনি। একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সেটা বলতেই ঠাকুরমশাইয়ের কাছে আসা।

সাতসকালে লোক এলে বড্ড বিরক্তির ব্যাপার। আমাদের মোটে দুটো খুপরি ঘর। ভিতরের ঘরে মা বাবা, আর সামনের ঘরে আমি আর আমার সাত বছর বয়সী ছোট বোন একসঙ্গে শুই। আমরা দুজনেই ঘুমকাতুরে বলে বেশ বেলা অবধি ঘুমোই। এখনও মশারি ফেলা, আমার বোনটা ঘুমোচ্ছে, এই অবস্থায় তো বাইরের একটা উটকো লোককে ঘরে ঢুকতে দেওয়া যায় না।

বললাম, বাবার তো জ্বর, এখনও ওঠেনি। কথাটা আমাকে বললে হয় না?

ছেলেটা ঘাড় কাত করে বলল, হয়।

বুঝতে পারছি লোকটাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলাটা ভারি অভদ্রতা হচ্ছে। কিন্তু উপায়ই বা কী!

ছেলেটা মাথা নিচু করে থেকে একটু অপরাধী গলায় বলল, হল কি জানেন, ঠাকুরমশাই না যাওয়াতে মধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী একটু চেঁচামেচি করছিলেন। আজ বিশ্বকর্মা পুজো বলে তারা ভালো আয়োজনও করেছিলেন। ঠাকুরমশাই না যাওয়াতে পুজো পন্ড হওয়ার জোগাড়।

আমি বললাম, কিন্তু ওঁদের বাড়ির কাছেই ফটিক ভট্টাচার্য বলে এক পুরুত থাকে, বাবা যেতে না পারলে তাকে দিয়েই তো পুজো করান ওঁরা।

ছেলেটা অসহায় মুখ করে বলল, বললাম যে আজ বিশ্বকর্মা পুজো। আজ সব পুরুতই ব্যস্ত। কাউকে পাওয়া যায়নি।

তাহলে পুজোটা করল কে?

আমি।

তাহলে গন্ডগোলটা কোথায়? আপনি কি পুজোর মন্ত্রে ভুল করেছেন?

না, নদীয়ার শান্তিপুরে আমি বিস্তর পুজো করেছি।

তাহলে?

পুজো করার ফলেই গন্ডগোল। মধুবাবু আর বউদি, দুজনেই পুজো দেখে ভীষণ খুশিও। তাঁরা সাফ বলে দিলেন, এখন থেকে নিত্যপুজো আমিই করব।

আমার হাই উঠছিল। হাইটা চাপতে গিয়ে কান দিয়ে বাতাস বেরিয়ে গেল। কান দিয়ে কী করে বাতাস বেরোয় বাবা কে জানে! বললাম, তাতেই বা কি হল? আপনার তো ভালই হল তাহলে!

ছেলেটার চোখ দুটো বেশ সুন্দর। টানা টানা বলেই নয়, চোখের চাহনীটা খুব স্বচ্ছ। একটা পবিত্রতা আছে। আমার কথায় চোখ দুটো ভারি করুন হয়ে গেল এবং একটু সামলে নিয়ে বলল, ঠাকুরমশাইয়ের চোখে। ঠোঁট কামড়ে ছেলেটা একটু সামলে নিয়ে বলল, ঠাকুরমশাইয়ের অবস্থা আমি জানি। সামনেই তাঁর মেয়ের বিয়ে, মাসে দেড়শো টাকা ঘরে পুজো বাবদ পেতেন। টাকাটা তো কম নয়। মধুবাবুর কাছে মেয়ের বিয়ের জন্য কিছু টাকা ধার চেয়ে রেখেছেন। মধুবাবু টাকাটা দেবেন বলে কবুলও করেছেন। কিন্তু কাজটা গেলে ঠাকুরমশাই আর টাকাটা পাবেন না।

আমি এবার মন দিয়ে ছেলেটাকে দেখলাম। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হবে। মাথায় খুব ছোট ছোট চুল। মনে হল, কিছুদিন আগেই ন্যাড়া হয়েছিল। মাজা রং, ছিপছিপে লম্বা চেহারা। কিন্তু সবচেয়ে চোখ টানে মুখের সরলতা।

বললাম, তার জন্যই ছুটে এসেছেন?

ছেলেটা সবেগে ওপর নীচে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ। উনি গিয়ে বাবুকে একটু বুঝিয়ে বললে কাজটা হয়তো যাবে না।

আমি বললাম, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি বাবাকে গিয়ে বলছি।

বাবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আমি ঘরে ঢুকতেই বলল, কে এসেছে রে? কার সঙ্গে কথা বলছিস?

মধুসূদনবাবুর বাড়ি থেকে একটা ছেলে এসেছে।

বাবা অবাক হয়ে বলল, কে বল তো! টুলু নাকি?

নাম বলেনি। লম্বা মতো, মাথা ন্যাড়া।

বাবা ধড়মড় করে উঠে বলল, ও তো টুলু। বড্ড ভাল ছেলেটা। ডাক ডাক, ভিতরে এনে বসা।

বসাব কি করে? বাইরের ঘরে যে মশারি ঝুলছে।

তাতে কিছু হবে না। টুলু ওসব মাইন্ড করবে না। বড় ভাল ছেলে রে, সংস্কৃত উচ্চারণটাও নিখুঁত। বসতে বল, একটু চা-মুড়ি দে। আমি আসছি।

অন্য সময় হলে বিরক্ত হতাম। কিন্তু আজ এ কথায় আমার একটুও বিরক্তি হল না।

গিয়ে ছেলেটাকে বললাম, আপনি ভিতরে এসে বসুন। বাবা আসছে।

ছেলেটা লাজুক মুখে বলল, বাইরেই তো বেশ আছি।

বাবা আপনাকে ভিতরে এসে বসতে বলল।

ছেলেটা ভারি সংকুচিত হয়ে নরম গলায় বলল, সকালবেলায় অন্য কারও ঘরে ঢুকলে একটা কেমন বাসি গন্ধ পাওয়া যায়। না? তার চেয়ে এই খোলা হাওয়ায় দাঁড়ানোই ভাল।

একথায় আমার রাগ করা উচিত ছিল। আমার মুখের ওপর একথা কি ওর বলা উচিত? কিন্তু রাগ করা গেল না। কথা বলার ধরনটার জন্য। একটু মিচকে হাসি ছিল সঙ্গে, কথাটায় খোঁচা ছিল না। আমি হেসে ফেললাম।

বললাম, আপনি ও বাড়িতে কী করেন?

থাকি।

কর্মচারী নাকি?

একরকম তাই। মধুবাবুর ছেলেকে অঙ্ক করাই। আর মধুবাবুকে ঘুড়ি ওড়াতে শেখাই। তার বদলে থাকতে দিয়েছেন।

আমি দ্বিতীয়বার হাসলাম। অঙ্ক আর ঘুড়ির কম্বিনেশন কখনও শুনিনি। বললাম, ইচ্ছে করলে ঘরে এসে বসতে পারেন। আমি আপনার জন্য চা করতে যাচ্ছি।

লোকটা চোখ বড় বড় করে বলল, চা? তার দরকার নেই তো। চা-পাতার যা দাম!

আমি স্মিত মুখে বললাম, আমরা সবাই এখন চা খাব, তাই আপনার জন্য বাড়তি খরচ হবে না।

ও, তাহলে একটু আদা দিয়ে করবেন। আদারও কিন্তু খুব দাম।

অত দাম দাম করছেন কেন বলুন তো! দাম নিয়ে ভাবতে হবে না। কিন্তু আদা দিতে বলছেন কেন? আপনার কি ঠান্ডা লেগেছে?

লোকটা ভীষণ সুন্দর করে ঝকঝকে সমান দাঁতে হেসে বলল, তা নয়, আসলে গরিবদের বাড়ির চায়ে একটা বিটকেল গন্ধ হয়। সোঁদা সোঁদা গন্ধ। আদা দিলে গন্ধটা মরে।

আমার রেগে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ওর হাসিটার জন্যই রাগের ঝাপটাটা লাগল না। তবু বললাম, অপমান করছেন নাকি?

ছেলেটা মাথা নেড়ে বলে, না, না, অপমান হবে কেন? আমিও গরিব, আমাদের বাড়ির চায়েও ওরকম একটা গন্ধ হত বলে মা একটু আদা ছেঁচে ফেলে দিত।

গম্ভীরভাবে বললাম, ঠিক আছে, তাই হবে।

ঘরে ঢুকে খুব হাসলাম। ছেলেটা আচ্ছা পাগল তো!

চা নিয়ে কখন সামনের ঘরে এলাম যখন বাবা আর টুলু মুখোমুখি বসে আছে। বাবার মুখ শুকনো, দুর্বল গলায় বাবা বলছিল, বিশ বছরের সম্পর্ক এক কথায় চুকিয়ে দিলে হে? মধুর বাবার আমল থেকে আছি যে!

চা-টা খেয়ে উঠে পড়ুন ঠাকুরমশাই, লোহা গরম থাকতে থাকতে ঘা মারতে হয়।

।।তিন।।

কুসুমকুমার

আশ্বিনে নরুবাবুর গো-ডাউনে লরিতে মাল লোড আর লরি থেকে মাল খালাসের একটা কাজ পেয়েছিলাম। দিনমজুরির কাজ, রোজ পঁচিশ টাকা করে। সকাল ন'টার মধ্যে হাজির হতে পারলে কাজ জুটত, দেরি হলে অন্য লোক ঢুকে যেত। আমার অবশ্য দেরি হত না। সময়মতো চলে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতাম। ম্যানেজার বাবুর খাতায় নাম লিখিয়ে ঢুকে পড়তাম কাজে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। লোহার পাত আর চট দিয়ে মোড়া বড় বড় চৌকো সব প্যাকেট। কী যে আছে ভিতরে কে জানে, কিন্তু তুলতে নামাতে হাড় মটমট করত। আমার কিছু খারাপ লাগত না। বসা কাজের চেয়ে এ বেশ ভাল। অন্য সব কুলিদের সঙ্গে আমার বেশ ভাবসাব হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মুশকিল হল, একদিন নরুবাবু নিজেই একটা গুরুতর লোডিং দেখতে এসেছিলেন। রোজ যেমন করি তেমনি সেদিনও জামাটা ছেড়ে রেখে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে মাল তুলছিলাম। গো-ডাউনের ফটকে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখছেন। ফর্সা মোটাসোটা চেহারা, মুখখানা বেশ গম্ভীর গোছের।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন নরুবাবু, এই! এই! ওই ছেলেটা কে দেখ তো নরেশ? ওই যে, গলায় পৈতে?

ম্যানেজার নরেশবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাকে পাকড়াও করে জামা ধরে নিয়ে নরুবাবুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

নরুবাবু কটমট করে চেয়ে বললেন, তুমি বামুন?

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, যে আজ্ঞে।

সত্যিকারের বামুন নাকি কালিঘাটে গিয়ে পৈতে চড়িয়েছ?

আমি বিরস মুখে বললাম, তাতে লাভ কি? আজকাল আর বামুনের নাম কে দেয় বলুন?

নরুবাবু কোমরে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, শোনো বাপু, বামুনকে দিয়ে কুলির কাজ করিয়ে নরকে যেতে পারব না। তুমি আজকের পাওনাটা নরেশের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে বিদেয় হও।

আমি হাঁ করে নরুবাবুর দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললাম, যে আজ্ঞে। তবে বামুনকে উপোসী রেখে তাতে মারলেও শুনেছি পাপ হয়।

নরুবাবুর চোখ দুখানায় দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। বুঝলাম উনি মুশকিলে পড়েছেন। একটু দোনোমোনো করে বললেন, তা হলেও তোমাকে দিয়ে কুলিগিরি করাতে পারব না বাপু। তোমার কি অবস্থা খুব খারাপ?

আজ্ঞে কহতব্য নয়।

তাহলে বরং কাল এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। বামুন সম্পর্কে আমার একটু দুর্বলতা আছে।

পরদিন যেতেই নরুবাবু বললেন, হিসেব রাখতে পারবে?

শক্ত কী? অঙ্কে মাধ্যমিকে আমি ষাট পেয়েছিলাম।

নরুবাবুর চোখ কপালে, বল কী? মাধ্যমিক পাস নাকি তুমি?

যে আজ্ঞে।

আরে রাম রাম। মাধ্যমিক পাস সেকথা আগে বলবে তো! তাহলে নরেশের কাছে কাজ বুঝে নাও। হিসেবপত্র রাখতে হবে।

আমার ডেজিগনেশন হল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। মাসে তিন হাজার টাকা বেতন, হাতে পাওয়া যাবে আটশ। হরেদরে কাশ্যপ গোত্র। কুলিগিরি করলেও বত্রিশ দিনে ওই আটশোই হয়।

দিন কয়েক বাদে নরেশবাবু চশমার ভিতর দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, তুমি বেশ তৈরি ছেলে হে! পৈতের জোরে দিব্যি কুলি থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেলে।

আজ্ঞে পৈতের যে এখনও দাম আছে সেটা আমিও জানতাম না। আজকাল অনেক জায়গায় বামুন দেখলেই ঠ্যাঙায়। তাই নাকি?

যে আজ্ঞে। দক্ষিণ ভারতে বামুনরা নাকি লোকের দু'চক্ষের বিষ।

খুব ভাল, খুব ভাল। ওরকমই হওয়া উচিত। নরুবাবুর যেমন বামুন-প্রীতি দেখছি তাতে দুদিন পর না তোমাকে আমার ওপরে বসিয়ে দেন! আগে জানলে এফিডেবিট করে চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে কিছু একটা হয়েই ঢুকতুম।

আমি বিনীতভাবে বললাম, আজ্ঞে বামুনের বিপদটাও তো দেখবেন। নরুবাবু তো আমার চাকরিটা খেয়েই নিচ্ছিলেন। আসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে আমার হাতিঘোড়া কিছু লাভ হয়নি। বেতনটা কুলির রেটেই আছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরেশবাবু বললেন, আমি পাঁচ হাজার টাকার ভাউচারে সই করে কত পাই জানো? কুল্যে বারোশো।

দুইজন দুঃখী মানুষের দুটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল। দুটি দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একটা অবশ্য কৃত্রিম। সেটা আমার। আটশো টাকার চাকরি পেয়ে নিজেকে আমার তেমন দুঃখী মনে হয় না। আটশো টাকা কিন্তু কম নয়।

সরু তারের ওপর এক চাকার সাইকেল চালানো নিশ্চয়ই খুব কঠিন কাজ। কিন্তু কিছু লোক তো চালায়ও। অঙ্কের মাথাটা পরিষ্কার থাকলে আটশোতেই ভেসে যায়।

কুলি থাকাকালীন আমি তাদের সঙ্গে ফুটপাথে ইটের ওপর বসে ঝকঝকে পেতলের থালায় ছাতুর মস্ত বড় ডেলা দিয়ে লানচ সারতাম। তারপর ঢকাঢক ঘটিভর জল। ছাতুর সুবিধে হল সেটা পেটে গিয়ে ফোলে। ঘন্টায় ঘন্টায় জল খেয়ে গেলে ফুলে ফেঁপে পেট ভরে রাখে। ঠিক যেন লক্ষ্মীর ঘট। অভ্যাসটা আমি ছাড়িনি।

নরেশবাবু তাঁর প্লাস্টিকের টিফিন বাক্স খুলে শুকনো রুটি আর তরকারি খেতে খেতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কুলিদের সঙ্গে ফুটপাথে বসে ছাতু খাও, তোমার ঘেন্না করে না?

আজ্ঞে না। ফুটপাথে খোলা রোদে-হাওয়ায় বসে খাই, দিব্যি লাগে।

কিছুক্ষণ পর নরেশবাবু সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করেন, ছাতু খেতে কেমন হে?

আজ্ঞে চমৎকার। যেমন গন্ধ, তেমনই স্বাদ। সঙ্গে একটু আচারও দেয়। অম্বল হয় না?

না তো! গরিবের আবার অম্বল কিসের?

আহা, গরিব তো আমিও। কিন্তু আমার বেশ অম্বল হয়।

একদিন ছাতু খেয়ে দেখুন না! ফুটপাথে বসে পারব না হে বাপু।

ঠিক আছে, আমি এনে দেবোখন।

পরদিন একটু ছাতু খেয়ে নরেশবাবুর মুখ উজ্জ্বল হল, বাঃ, খেতে তো বেশ।

পরদিন থেকে নরেশবাবু আর বাড়ি থেকে টিফিন আনতেন না, ছাতুর সূত্রেই আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল।

ফুরফুর করে দিন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে শান্তিপুরের বাড়িটার জন্য মনটা একটু হু-হু করে বটে, কিন্তু ভেবে সময় নষ্ট করে কীই বা হবে!

বহুকাল বাদে গোকুল ছুটি পেয়ে দেশে গেছে। সেদিনই রাত দশটা নাগাদ হঠাৎ চাঁপা এসে হাজির। হাতে একখানা ঢাকা-দেওয়া থালা।

আমি তটস্থ হয়ে বললাম, ওটা কী?

তোমার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে? না এইবার খাবো। কী খাবে, চিঁড়ে?

লজ্জিত হয়ে বলি, চিঁড়ে খেতে বেশ। তোমার ভাতের খিদে পায় না?

চিঁড়ে আর ভাতে তফাত কি? চিঁড়ে ভিজলে তো ভাতেরই সমান।

তোমার মাথা! খুব পিচেশ আছ তুমি বাপু। গরম ভাতের সঙ্গে ভিজে ন্যাতানো চিঁড়ের কি তুলনা হয়? শোনো বাপু, এ বাড়িতে নানা গোপন বন্দোবস্ত আছে। কিরকম?

ঠাকুর-চাকরের জন্য যে আলাদা মোটা চালের ভাত রান্না হয় তা একটু বেশি করেই হয়। তাতে আমরা পয়সা নিয়ে দু-চারজন উপরি লোককে চোরাপথে খাওয়াই। তুমি যদি পাঁচটা করে টাকা দাও তাহলে রোজ রাতে তোমাকে গরম ভাত খাওয়াতে পারি।

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, পাঁচ টাকা! বলো কী? আমি তো বাজারের সবচেয়ে সস্তা মোটা চিঁড়ে কিনে আনি। দু'মুঠো ভিজিয়ে রাখি। তাই ফুলে এতখানি হয়ে যায়। একটু গুড় দিয়ে সপাসপ মেরে দিই। আত্মাকে আর কত কষ্ট দেবে?

আত্মা কি কষ্ট পায় নাকি চাঁপারানি? আত্মার সুখও নেই, দুঃখও নেই, খায়ও না হাগেও না, ঘুমোয়ও না, জাগেও না, জন্মায়ও না, মরেও না.....

রক্ষে করো বাপু, আমার ঘাট হয়েছে। ঠিক আছে তুমি না হয় তিনটে করেই টাকা দিও। তাতে হবে?

তিন টাকায় আমি রাজি হয়ে গেলাম। অনেক দিন হল ভাতটাত পেটে যায়নি।

চাঁপা ঢাকনা খুলতেই আমার চোখ চড়কগাছ। এ করেছে কি চাঁপা? ভাত, ডাল, ঘ্যাঁট, দুটো পটল ভাজা এবং অবিশ্বাস্য এক টুকরো মাছ অবধি! সস্তার হোটেলেও টাকা বারো নেবে।

চাঁপা খাপ পেতে বসে আমার খাওয়া দেখছিল। হঠাৎ বলল, মাস্টার, আমাকে বিয়ে করবে? এমন চমকে উঠেছি যে বিষম খাওয়ার জোগাড়। বলো কী?

কী এমন খারাপ কথাটা বললুম? তুমি না গোকলোর ইয়ে!

মরণ? ওটা কি মনিষ্যি নাকি? হাড়হাভাতেটার দেশে বউ আছে, গুচ্ছের ছেলেপুলে। মাইনে কত পায় জানো? মোটে দুশো টাকা।

উঁহু, উঁহু, হিসেবটা ঠিক হচ্ছে না। কিসের হিসেব?

দুশো টাকার সঙ্গে দু'বেলার খোরাকিটা জুড়ে নাও। তাহলে পাঁচ সাতশোয় দাঁড়াবে। উপরিও বোধহয় কিছু আছে।

জুড়তে হলে তুমি জোড়ো গে। আমার গোকলোকে পছন্দ নয়, তোমাকে পছন্দ।

আমি তটস্থ হয়ে বলি, সর্বনাশ! আমার মতো লক্ষ্মীছাড়াকে কি মনে ঠাঁই দিতে আছে চাঁপাদিদি? যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে মন থেকে তাড়াও।

চাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এইজন্যই তোমাকে সবাই ভাল বলে মাস্টার, হাতের কাছে একটা রাজি মেয়েকে পেয়ে আর কেউ হলে ছেড়ে দিত না, বিয়ের ভাঁওতা দিয়ে একটু হলেও চেখে দেখত।

এঁটো থালা গুছিয়ে নিতে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল চাঁপার। আমি মনে মনে একটু হতাশ হয়ে পড়লাম। এই প্রত্যাখ্যানের পর নিশ্চয়ই আর চাঁপা আমাকে রোজ তিন টাকায় ভাতের থালা এনে খাওয়াবে না।

হঠাৎ চাঁপা অন্তর্যামীর মতো আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, ফিরিয়ে দিচ্ছ বলে ভেবো না যে চাঁপা তোমাকে আর ভাত দেবে না, ভাত ঠিক পাবে। তবে প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখো। আমিও দুশো টাকা মাইনে পাই। শাড়ির ফলস লাগানো, অ্যাপ্লিক, রিপু, লেস বোনা, সোয়েটার বোনা এসব করেও রোজগার কম করি না। দু'জনের রোজগার মিলে কম হবে না। ফ্যালনা নই, বুঝলে?

বুঝলাম। তবে আমার ফুরফুর করে বয়ে যাওয়া দিন একটা হোঁচট খেল। ভগবান সবসময়ে সুখ-দুঃখের রাশ টেনে রাখেন, কোনওটা বেড়ে গেলেই ছোট্ট একটু টানে সামাল দিয়ে দেন।

কথাটা হল মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই। পুরুষের যে মেয়েমানুষ দরকার হয়, আর মেয়েমানুষের যে পুরুষ এ কে না জানে! আমি ওরকমই জানি। ভাসা ভাসা মতো, আবছা-আবছা। কারণ আমার দরকারটা কখনও মাথা-তোলা দেয়নি। দেওয়ার কথাও নয়। খিদে, ভয়, অনিশ্চয়তাই সব কিছুকে গিলে ফেলে। আমারও যে কোনওদিন একটা মেয়েমানুষ হবে এটা একটা রূপকথার মতো ব্যাপার। একটা সুন্দরী মেয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন মানুষ যেমন তাকে দেখে, তেমনি গরু কুকুর কাকও দেখে। তফাতটা হল মানুষের তাকে দেখে উদ্দীপনা হয় আর গরু কুকুর কাকেরতা হয় না। আমারও ওইরকম অবস্থা। আচ্ছা বরং আরও একটু ঘুরিয়েই বলি। ধরা যাক একজনের দাঁতের ব্যথায় ব্রহ্মতালু অবধি ঝিলিক মারছে, প্রাণ ওষ্ঠাগত। তখন একজন সুন্দরী মেয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালে সে কতটা চেগে উঠবে? বরং মুখ ফিরিয়ে নেবে বিস্বাদে। তখন সুন্দরী মেয়ের জায়গায় একজন দাঁতের ডাক্তার এসে দাঁড়ালে তার বুক নেচে ওঠার কথা। আমার অবস্থা ওই

দাঁতের রুগিটার মতোই। এই যে চোখের ওপর কালো ধলো নানা মেয়েমানুষ রোজ পথেঘাটে ভেসে যাচ্ছে তারা আমার চোখে পড়ে বটে, কিন্তু মগজে কোনও ছাপই ফেলতে পারে না। কারণ তখন আমি হয়তো গভীরভাবে সাত টাকা পঁচাত্তর পয়সায় আরও তিনদিন কী করে চালানো যায় সেই চিন্তায় মগ্ন। আইনস্টাইনের সঙ্গে তখন আমার তফাত নেই।

মধুবাবুর বউ নন্দরানি-অর্থাৎ বউদিমণি আগে আমার সামনে বেরোতেন না। আজকাল বেরোন। দোতলার যে ঘরটায় বসে আমি মধুবাবুর ছেলে রজতকে পড়াই সেখানেই পড়ার মাঝখানে এসে হানা দেন।

বউদিমণির রং বেজায় ফর্সা, ছোটখাটো, গোলগাল, পুতুল-পুতুল চেহারা। গা ভর্তি গয়না, পরনে দামী শাড়ি, হাতে রুপোর পানের বাটা, মাথার ঘোমটা কখনও খসতে দেখিনি। বয়স আমার মতোই হবে, ত্রিশের কাছে-পিঠে। তো আমার আঠাশ চলছে। বউদিমণিকে যে আমি মন দিয়ে লক্ষ করেছি সেটা নারী-পুরুষ জনিত ব্যাপার নয়। মনিব-চাকর জনিত ব্যাপার, চাকরকে সর্বদাই মনিবের মনোভাব অনুধাবন করে চলতে হয়। আর সেইজন্যই মনিবের মুখ আর হাবভাব ভাল করে লক্ষ করা চাই। মনিবের কোন কথায় কোন প্যাঁচ, কোন হাসিটা বিদ্রূপের আর কোনটা প্রশ্রয়ের এসবও একজন চাকরের জানা থাকা দরকার।

প্রথমদিন বউদিমণি আমার বাড়ির খোঁজখবর নিলেন, কে কে আছে, কীরকম অবস্থা, মা কত ভরি গয়না রেখে গেছে ইত্যাদি। দুদিন পর জানতে চাইলেন শান্তিপুরের শাড়ির ইতিবৃত্তান্ত। তারপর একদিন আমাকে নিজের ডান হাতের সোনার বালাটা দেখিয়ে বললেন, বলুন তো কত ভরি আছে!

কত ভরি বললে উনি খুশি হবেন তা বুঝতে না পেরে আমি একটু বাড়িয়েই বললাম, তা দশ ভরি তো হবেই। বেশিও হতে পারে।

ওমা! আপনি তো সত্যিই অঙ্কে খুব ভাল? এটা আমার শাশুড়ির বালা, বিয়ের সময় হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। পাক্কা দশ ভরি। কিন্তু জানেন তো, এত ভারী বালা নিয়ে হাত নাড়াতে কষ্ট হয়। ভাবছি ভেঙে একটু হালকা করে গড়াব। তা বেশ তো?

সোনার ভরি যদি পাঁচ হাজার টাকা করে হয় তাহলে বালাটার দাম কত উঠবে বলতে পারেন?

এ তো সোজা! পঞ্চাশ হাজার। দুর বোকা! পান বাদ যাবে না?

ও হ্যাঁ। সোনায় তো আবার পান থাকে শুনেছি। তা পান কতটা থাকে আর কত দাম সেটা জানলে হিসেব করে দিতে পারি।

সেটা জানার উপায় নেই। স্যাঁকরারা তো ওই পানেই চুরিটা করে কিনা, আমাদের শচীশ স্যাঁকরা হল একটি বিচ্ছু। সীতাহারটা ভেঙে নেকলেস করে দিতে গিয়ে তিন ভরি সোনা চুরি করল। তাহলে ওকে দিয়ে না করানোই তো ভাল।

দুর! সবাই একরকম। তবে শচীশকে কেন তাড়াই না জানেন, যে ডিজাইনটা দেখিয়ে দেব সেটা নিখুঁত তুলে দেবে। হাত খুব পাকা।

সায় দিয়ে বললাম, তাহলে শচীশকে রাখাই ভাল।

না রেখে উপায় কী বলুন, আমার শ্বশুরের আমল থেকে এ বাড়ির গয়না গড়িয়ে আসছে। অন্তত ত্রিশ বছর তো হবেই, আচ্ছা এই ত্রিশ বছরে ও এ-বাড়ির কত সোনা মেরেছে বলে আপনার মনে হয়?

আমি খুব চিন্তিতভাবে সিলিঙের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হাতের কড় গুণে, হিসেব কষার ভান করে বললাম, তা ধরুন গে, বছরে সাত আট ভরি ধরলে ত্রিশ বছরে দুশো সোয়া দুশো ভরি। তার দাম কত হয়?

এবাজারে তা ধরুন দশ লাখের ওপরেই দাঁড়াচ্ছে।

তাহলেই বুঝুন শচীশ কীরকম চোর? আমি তো হিসেবটিসেব অত বুঝতে পারি না, শচীশ আমাকে যা-তা বুঝিয়ে দেয়। উনি অবশ্য আমার চেয়ে হিসেব একটু বেশি বোঝেন, কিন্তু উনিও শচীশের সঙ্গে এঁটে ওঠেন না। তাই ভাবছি এবার শচীশকে ডাকা হলে আপনাকে লেলিয়ে দেব।

"লেলিয়ে দেবো" কথাটা আমার তেমন পছন্দ হল না। তবু খুব বিগলিত হেসে বললাম, সে তো আমার ভাগ্য। শচীশের গায়ে বেশি জোর নেই তো?

বউদিমণি হেসে গড়িয়ে পড়লেন, আর না না, সে বুড়ো মানুষ। আর জোর থাকলেই বা কী, আপনাকে মারবে নাকি?

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, না, এই বলছিলাম আঁটঘাট বেঁধে কাজ করাই ভাল, রুজিরোজগারে হাত পড়লে অনেকে বেজায় চটে যায় কিনা।

শচীশকে আপনি লাঠিপেটা করলেও চটাতে পারবেন না। মুখ খুব মোলায়েম, মিষ্টি মিষ্টি হাসি, মিঠে মিঠে কথা। সেরকমই হয়ে থাকেন ওরা।

আচ্ছা আপনি তো ঠাকুরমশাইয়ের বাড়িতে মাঝে মাঝে যান না?

আজ্ঞে না। ওই একদিনই ওকে ডাকতে গিয়েছিলাম, যেদিন কাজটা করেছিলেন, সেই যে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন।

আপনি খুব অদ্ভুত। সেদিন আপনার পুজো দেখে আমাদের এত ভাল লেগেছিল, কেন যে আপনি পুরুতের কাজটা নিলেন না! আপনার সংস্কৃত উচ্চারণ কী সুন্দর, আর ঠাকুরমশাইয়ের উচ্চারণ কী বিচ্ছিরি! ওরকমভাবে মন্ত্র পড়লে কি ভগবানকে খুশি করা যায়?

আমি খুব বিনীতভাবে বললাম, আজ্ঞে, ভগবান মন্ত্রটন্ত্র মেলা শোনেন, ওতে টলেন না। ঠাকুরমশাইয়ের উচ্চারণ তেমন ভাল নয় বটে, কিন্তু ভক্তির খুব জোর আছে।

আহা ভক্তি তো আমাদেরও আছে। পুজো না হলে জল অবধি খাই না। খাই, বলুন? শুধু ভক্তিতে কাজ হলে আর পুরুত রাখা কেন? মন্ত্র না হলে চলে?

আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন। দুটোই বলেছেন। দুটোই লাগে। ধরুন মন্ত্রটা হল নৌকে, আর ভক্তিটা হল বৈঠা। ওই ভক্তির বৈঠা মেরেই তো মন্ত্রের নৌকোটাকে ভগবানের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হয় কিনা। শুধু বৈঠা হলেও হবে না শুধু নৌকা হলেও হবে না।

বাঃ আপনি তো বেশ বললেন? তা আপনার কি ভক্তি নেই নাকি? আমি যে ঘোর পাপী। তাই বুঝি? তা কী কী পাপ করেছেন শুনি।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম, এখনও তেমন কিছু করে উঠতে পারিনি বটে। ফুরসত পেলেই হয়তো করে ফেলব। যাঃ, আপনি তো বেশ ভাল লোক। যে আজ্ঞে।

আচ্ছা, ঠাকুরমশাইয়ের মেয়েকে আপনি দেখেছেন?

মেয়ে? বলে আমি খুব চিন্তান্বিত হয়ে পড়লাম। কোনও মেয়েকে দেখেছি কিনা মনে পড়ল না। মাথা নেড়ে বললাম, না। দেখেননি! মনে হচ্ছে, না।

আচ্ছা, আপনি একটা কী! শুনেছি মেয়েটার নাকি বিলেত ফেরত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে? আমি চোখ বড় বড় করে বললাম, তাই?

আমার তো বাপু বিশ্বাস হয় না। গায়ের রং তো নিশ্চয়ই হাকুচ কালো, আর মুখেরই বা কী এমন ছিরিছাঁদ হবে বলুন? আজকাল তেলে যা ভেজাল, মাথার চুলও নিশ্চয়ই পড়ে পড়ে ব্যাঙাচির লেজ হয়ে গেছে, ও মেয়ের কী করে বিলেত ফেরত পাত্র জুটছে, বলুন তো?

এটা তো ভাববার কথা।

লেখাপড়াও বেশি দূর নয়, মাধ্যমিকটা বোধহয় টেনেমেনে পাস করেছে। তাই হবে।

তাহলে ও মেয়ের মধ্যে পাত্রপক্ষ কী দেখল?

কিছু না, কিছু না। দেখার আছেটাই বা কী?

না না, ওরকম ভাসা-ভাসা কথায় হবে না। আপনি একদিন গিয়ে মেয়েটাকে দেখে আসুন তো! ভাল করে দেখবেন। একেবারে আগাপাশতলা। তার পর আমাকে এসে সব বলবেন। আমি সেই থেকে ভেবে মরছি, ঠাকুরমশাইয়ের মেয়ের এমন

বিয়ে হয় কি করে? তারপর শুনছি, মেয়েও নাকি বরের সঙ্গে বিলেত যাবে, মেম সেজে গ্যাটম্যাট করে ঘুরে বেড়াবে।

আমি হুংকার ছাড়ার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে বললাম, বটে! বটে!

কবে যাবেন বলুন তো! যবে বলবেন। কালকেই গিয়ে ঘুরে আসুন। যে আজ্ঞে।

আচ্ছা সেদিন যে ওদের বাড়ি গেলেন ওরা ঘরে ডেকে বসায়নি?

তা বসিয়েছিল। চা-টা খাওয়ায়নি?

আজ্ঞে মনে পড়ছে, চায়ের সঙ্গে দুটো থিন অ্যারারুট বিস্কুটও ছিল।

চা দিতে কে এসেছিল?

আমি খুব চিন্তিতভাবে বলি, একটা মেয়েই তো মনে হচ্ছে।

বউ নয় তো? মানে ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী নন তো!

তাও হতে পারে। না না, ঠাকুরমশাইকে বাবা বলেই ডাকছিল যেন।

উঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারি না।

আমি খুবই লজ্জিতভাবে চুপ করে থাকি।

উনি মৃদু মৃদু হাসলেন, কাল সকালেই যাবেন কিন্তু। এমনি গেলে কিছু ভাবতে পারে। আপনি বরং ভাণ্ডারীর কাছ থেকে ঠাকুরমশাইয়ের জন্য একটা সিধে নিয়ে যাবেন। বলবেন আমি পাঠিয়েছি। যে আজ্ঞে।

রাহা খরচ বাবদ বউদিমণি পাঁচটা টাকাও দিলেন।

ব্যাপারটা হল বউদিমণি যা জানতে চান তার জন্য ঠাকুরমশাইয়ের মেয়েকে দেখতে না গেলেও চলে। দেখতে মেয়েটা যেমনই হোক আমাকে এসে বলতেই হবে যে, মেয়েটা কালো, কুচ্ছিৎ, মাথায় চুল নেই, সেই সঙ্গে যদি দাঁত উঁচু বা হাড়গিলে যোগ করে দিই তাতেও বউদিমণি খুশিই হবেন। বউদিমণি মেয়েটাকে না দেখেও যে বিবরণ দিয়েছেন-আমি চাকর মানুষ তার বাইরে যাই কি করে?

তবে এটাও ঠিক কথা যে, সেদিন আমি মেয়েটাকে ভাল করে দেখিনি। গরিবের পক্ষে এটা একটা বিরাট বড় ভুল। গরিবের উচিত সর্বদা সব কিছু খুব ভাল করে নিরীক্ষণ করা, নিখুঁত ও পরিষ্কার পর্যবেক্ষণ না থাকলে গরিবের পক্ষে মুশকিল। পথে পড়ে থাকা টাকাটা সিকেটাও তার নজরে পড়বে না। কাঙালিভোজের ফেস্টুন তার চোখ এড়িয়ে যাবে। কানা বেগুন কিনতে গিয়ে হয়তো ভাল বেগুন দর করে বসবে। গরিবের তাই চোখ চাই। আমার চোখ কিন্তু খারাপও নয়। সব সময়ে, সব জায়গায় আমি চারদিকটা বেশ করে নিরীক্ষণ করি। জায়গা, মানুষ, সুযোগসুবিধে, লাভালাভ, সুযোগটুযোগ। সেই দিনটায় মাথাটা একটু বিভ্রান্ত ছিল বটে। ঠাকুরমশাইয়ের বিশ বছরের পুরনো কাজটা চলে যাচ্ছে বলে আমি হন্তদন্ত হয়ে

ছুটেছিলাম। যে দরজা খুলল সে কালো না ধলো, রোগাপটকা না ধুমসি তা অত খেয়াল করা হয়নি।

একবার ভাবলাম যাব না। বউদি যেমনটি চান তেমনটি বলে দিলেই তো হয়ে গেল। কিন্তু ভাণ্ডারীর কাছ থেকে সিধে নিয়ে যেতে হবে বলে কথা আছে। পাঁচটা টাকা রাহাখরচটাও তো পকেটস্থ করতে পারি না। সুতরাং যাওয়াই সাব্যস্ত হল।

দরজা খুলল মেয়েটাই। ও আপনি? ভিতরে আসুন। না না, এই তো বেশ আছি।

আজ ঘরে বাসি গন্ধ নেই। আমরা আজ সকালেই উঠেছি। বাবা তর্পণ করতে গেল কিনা।

ভারি লজ্জা পেয়ে বললাম, ঘরে বসার দরকার নেই। বউদিমণি এই সিধে পাঠিয়ে দিলেন।

মেয়েটা ভ্রূ কোঁচকালে মুখটা দেখলাম অন্যরকম হয়ে যায়। বেশ ভয়-ভয় করে। অবাক হলে বলল, সিধে! সিধে কেন?

গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, সিধে কেন তা অত ভেঙে বলেননি।

মেয়েটা হেসে বলল, চা খাবেন না? আদা দেওয়ার কথা মনে আছে কিন্তু।

কথা চলছে, আমি সেই ফাঁকে দিব্যি সকালের ফর্সা আলোয় মেয়েটাকে নিরীক্ষণ করে নিচ্ছি। কিন্তু মুশকিল হল মেয়েটা যে কেমন তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। নাক, চোখ, মুখের আদল, গায়ের রং, কতটা লম্বা, ফর্সা, রোগা না মোটা তা আলাদা আলাদা করে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। সুবিধে হল না। মেয়েদের ব্যাপারে আমি একেবারেই দিনকানা।

মেয়েটা বলল, সেই থেকে আমাদের বাড়িতে আপনাকে নিয়ে খুব কথা হচ্ছে।

ভয় খেয়ে বলি, কেন, কথা হচ্ছে কেন? আমি তো কিছু করিনি?

করেননি? আমার বাবার চাবরি বাঁচাতে মস্ত স্বার্থত্যাগ করেছেন যে! বাবা তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমি মাথা চুলকে বললাম, ব্যাপারটা তাই দাঁড়িয়েছে বুঝি? আসলে মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। ঠাকুরমশাই যাননি দেখে যে কটা সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়েছিল অংবং আউড়ে গিয়েছিলাম, মধুবাবু তাতেই খ।

ফের মিথ্যে কথা! বাবা তো আর মধুবাবু নয়। বাবা বলেছে আপনি পুজোআচ্চা ভালই জানেন।

তটস্থ হয়ে বলি, জানলেও ঠাকুরমশাইয়ের মতো ভক্তিভাবটা আমার নেই কিনা। পেটের দায়ে-

ফের মিথ্যে কথা! বাবারও ভক্তিভাব নেই মোটেই। বাবা পেটের দায়ে পুজো করে। এখন ভিতরে এসে বসুন তো! আমি চা করতে যাচ্ছি।

আমি শশব্যস্তে বলি, ন'টায় আমার হাজিরা। দেরি হয়ে যাবে।

দেরি হবে না। এখন পৌনে আটটা বাজে। আপনি ভিতরে আসুন।

ঠাকুরমশাইয়ের সামনের ঘরখানা বেশ দীনহীন, একধারে একখানা তক্তপোশে পাতা বিছানা ফ্যাটফ্যাটে সবুজ চেক বেডকভার দিয়ে ঢাকা। দুখানা লোহার চেয়ার, একখানা নড়বড়ে কাঠের টেবিল, তাতে প্লাস্টিকের ঢাকনা। তবে এই সামান্য জিনিসগুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একা বসে বসে এই কয়েকখানা জিনিসই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছি। উঁকি মেরে দেখে নিলাম, তক্তপোশের নীচে যথারীতি একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, গোটা দুই বয়ম আর একটা ফুলঝাড়ু আছে। সব বাড়িতেই খাট বা চৌকির নীচে কিছু না-কিছু থাকবেই।

বাইরে একটা ভিখিরি ঘ্যান ঘ্যান করছে, দ্যান মা! ওমা!

একটা ফ্রক পরা বাচ্চা মেয়ে ভিতর থেকে দৌড়ে এসে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে ছোট্ট একটা জর্দার কৌটোয় ঘপ করে চাল তুলে নিয়ে গিয়ে ভিখিরিটাকে দিয়ে এল। আমি বড় বড় চোখ করে দৃশ্যটা দেখছিলাম। তুমি কে খুকি?

বব করা চুল ঝটকা মেরে মুখ থেকে সরিয়ে ফুটফুটে মুখখানা দেখিয়ে বলল, আমি নগেন ভট্টাচার্যের ছোট মেয়ে। তুমি ভিখিরিটাকে ভিক্ষে দিলে! অ্যাঁ!

হ্যাঁ তো। আমরা সব ভিখিরিকেই ভিক্ষে দিই।

ও বাবা! সে যে বিরাট ব্যাপার। রোজ কজন ভিখিরি আসে?

পাঁচ-সাত জন। সবাইকে দাও? হ্যাঁ। বলে সে ঘাড় হেলাল।

আমার চোখ গোল হয়ে যাচ্ছিল। নগেন ভট্টাচার্য-মানে আমাদের ঠাকুরমশাই কি কল্পতরু নাকি? কৌটোটায় অন্তত পঞ্চাশ গ্রাম বা বেশিই চাল ধরে। চার কৌটোয় দুশো গ্রাম ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সাত কৌটো হলে সাড়ে তিন শো গ্রাম বা তারও বেশি। মাসে তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে? বাপ! সে যে অনেক! তা খুকি, একটা কথা বল তো?

মেয়েটা খুব কৌতূহল নিয়ে আমাকে দেখছিল। বলল, বলুন না।

বলছিলাম কি চালের বদলে যদি ভিখিরিদের দশ বা কুড়ি পয়সা করে ভিক্ষে দাও তাহলে কিন্তু মাসে অনেক চাল বেঁচে যাবে। মাকে বোলো।

মেয়েটার মুখটা একটু করুণ হয়ে গেল। বলল, আমাদের তো পয়সা থাকে না, চাল থাকে। চাল থাকে? হ্যাঁ। বাবা পুজো করে ভুজ্যি পায় তো!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তোমরা বেশ ভাল লোক। তাই না খুকি?

ধ্যেত! কী যে বলে!

দ্বিচারিণী

আমি আনমনে মেয়েটার দিকে স্বগতোক্তির মতো বলি, চাল যদি চৌদ্দো টাকা করেও কিলোগ্রাম ধরি তাহলে পঞ্চাশ গ্রামের দাম সত্তর পয়সা। যদি দশ টাকা করেও ধরি তাহলেও পঞ্চাশ পয়সা। নাঃ, তোমরা বেশ ভাল লোক, বুঝলে খুকি?

আপনিও ভীষণ ভাল লোক। কে বলেছে? সবাই বলে। আপনার নাম কি টুলু?

হ্যাঁ, টুলুই বটে। তবে আমার একটা পোশাকি নামও আছে শুনবে? হ্যাঁ। কুসুমকুমার।

ও মা, কুসুম তো মেয়েদের নাম! সেইজন্যই নামটা লোককে বলি না। তোমার নাম?

মৌটুসি। আমার দিদি মধুরিমা, আমি মৌটুসি। সবাই টুসি বলে ডাকে।

কী সুন্দর নাম তোমাদের। আর আমার এমনই কপাল, একটা চটকদার নাম অবধি জুটল না! টুসি হি হি করে হেসে ফেলল।

আমি উঠতে উঠতে বললাম, মানুষের যে কত সুন্দর সুন্দর নাম থাকে! না, তুমি আমার মনটাই তো খারাপ করে দিলে। আমি বরং চলেই যাই।

টুসি জানে, এটা ঠাট্টা। সে হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, ধ্যেত! কী যে বলে! মা আপনার জন্য গরম গরম রুটি করছে যে!

আমি অবাক হয়ে বললাম, রুটি! লোক এলে তোমরা রুটিটুটিও খাওয়াও নাকি?

বিস্কুটও খাওয়াই। আর চা।

সর্বনাশ! ঠাকুরমশাই দানছত্র খুলেছেন দেখছি! না, তাহলে তোমাদের বাড়ি আসা যাবে না। ওমা! কেন? দোকানে এক একখানা রুটির কত দাম জান?

না তো ! আমরা তো দোকানে খাই না, কী করে জানব?

এক টাকা থেকে দেড় টাকা। আর এক কাপ চাও এক টাকার কম নয়।

আমি কি ওসব জানি? লোক এলে যে খেতে দিতে হয়।

তাই বুঝি? সেইজন্যই তো আর তোমাদের বাড়িতে আসা ঠিক হবে না।

ইস! কেন আসবেন না শুনি! আসতেই হবে। রোজ।

ও বাবা! তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে। রোজ এলে যে রোজ আমাকে তোমরা খাওয়াবে! হ্যাঁ তো। বাবা কী বলেছে জানেন? আমি ভয় পেয়ে বলি, কী বলেছেন?

বাবা বলেছে, টুলু রোজ সকালে কিছু না খেয়ে চাকরি করতে যায়। খাই না কে বললে? ঠাকুরমশাই জানেন না। কী খান আপনি?

কেন, কলের জল আর হাওয়া। খেতে কিন্তু খুব ভাল।

এ কথাটায় হাসল না টুসি। মুখখানা করুণ হয়ে গেল। বলল, আহা রে! আপনি রোজ আসবেন, মা রোজ রুটি করে দেবে। মা না পারলে আমি করে দেব। আমার হাতের রুটি খুব সুন্দর ফোলে। বড় বড় চোখে চেয়ে বলি, তাই বুঝি!

হ্যাঁ তো। সবাই বলে, আমার হাত নাকি লক্ষ্মীর হাত।

পুরুতের বউরা যেমন শাড়ি পরে তেমনি একটু খাটো, লালপেড়ে মোটা বুনটের কাপড় পরা একজন মহিলা ঘোমটা মাথায় ঘরে ঢুকলেন। হাতে একখানা কাঁসার রেকাবি। ঘরে ঢুকেই খুব সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে এধার ওধার চাইছেন। লজ্জাই পাচ্ছেন মনে হয়। ফিসফিস করে বললেন, ও টুসি জল দিলি না? টুসি জল আনতে দৌড়ে গেল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ভারি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, এসবের তো কোনও দরকার ছিল না মা।

খুব নিচু গলায় উনি বললেন, খিদে তো পায় বাবা, নাকি? রসগোল্লা সন্দেশ তো নয়। সামান্য রুটি।

রুটি যে কী অসামান্য জিনিস সে আমিই জানি। রুটির পিছনে জল এল, জলের পিছনে টুসি, তার পিছনে ঘরে ঢুকল চা, চায়ের পিছনে মধুরিমা। তিন জোড়া করুণ চোখ আমার ওপরে স্থির হয়ে আছে। তিন জোড়া চোখ থেকে ঝরে পড়ছে সমবেদনা, মায়া, দুঃখীর দুঃখে দুঃখ।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। কোথায় যেন একটা ভুল হচ্ছে। করুণাঘন তিন জোড়া চোখ থেকে অসচ্ছ কারুণ্যবর্ষণে আমি এতটাই ভিজে গেলাম যে, কিছু বলার রইল না আমার। বলার আছেটাই বা কী?

তিনজনে তিন ধারে দাঁড়িয়ে আমার খাওয়া দেখছিল। চারখানা রুটি আলুর চচ্চড়ি দিয়ে খাওয়ার মধ্যে কোনও আর্ট নেই জানি। কিন্তু দর্শক জুটে যাওয়ায় আমি খাওয়াটাকে যথেষ্ট শিল্পসম্মত ও সংযত করার চেষ্টা করছিলাম।

মধুরিমা ধমক দিয়ে বলল, ও কীরকম ঠুকরে ঠুকরে খাওয়া হচ্ছে বলুন তো! ভাল করে খান। আরও রুটি আছে। আর লাগবে না।

কে বলেছে লাগবে না? পেট ভরে খেয়ে যেতে হবে। ডাল ফুটছে, এক বাটি নিয়ে আসছি দাঁড়ান।

মুখে যথাসাধ্য প্রতিবাদ করছি বটে, কিন্তু আমার উপোসি পেট থেকে কোনও প্রতিবাদ আসছিল না। চারখানার পর আরও চারখানা এবং তারও পর আরও তিনখানা রুটি সে নির্লজ্জের মতো আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নিল। কী লজ্জা! এরা আমাকে ভাববে কী?

আমি বললাম, এটা ঠিক হচ্ছে না।

দ্বিচারিণী

মধুরিমা বলল, কোনটা?

বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এগারোখানা রুটি-

আপনাকে কে রুটি গুনতে বলেছে?

কেউ বলেনি, গোনাটা আপনা থেকেই এসে যায়। আপনি খুব খারাপ লোক।

মুশকিলটা হল যে কাজে আসা সেইটেই কিছুতেই হয়ে উঠছে না। মেয়েদের রূপ অনেকটা ফলারের মতো। চোখ, নাক, মুখ, গায়ের রং যেন দুধ, কলা, চিড়ে, গুড়। ফলার যেমন মেখেজুখে একটা মোট স্বাদ হয় রূপ জিনিসটাও তেমনি। কিন্তু আমার সমস্যা হল, এগারোখানা রুটি খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েটার নাক, মুখ, চোখ, রং সব আলাদা আলাদা করে দেখলেও ফলারটা ঠিক হয়ে উঠল না। মেয়েটা যে দেখতে কেমন সেটা বুঝতে না পেরে আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

সন্ধেবেলাতেই বউদিমণি পানের বাটা নিয়ে পড়ারঘরে এসে হাজির।

ভাল করে দেখে এসেছেন তো? যে আজ্ঞে।

বউদিমণি বেশ গুছিয়ে বসে বললেন, বলুন তো কেমন দেখলেন!

আমি খুবই বিকৃত মুখ করে বললাম, যাচ্ছেতাই! যাচ্ছেতাই! কালো কুচ্ছিত, মাথায় চুল নেই।

আহা, অত হড়বড় করে বলতে হয় বুঝি? বেশ গুছিয়ে বলুন তো? আচ্ছা গায়ের রংটা কেমন? কালো। কালো না চাপা? কালো আর চাপায় তফাত কী?

বউদিমণি হেসে ফেললেন, ও মা! কালো আর চাপায়তফাত নেই? আচ্ছা ধরুন আমাদের চাঁপা। চাঁপার রং হল চাপা। আর ঘর মোছে গুণেনের মা, ও হল কালো।

আমি আলো দেখতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বললাম, না না, চাঁপা নয়, চাঁপা নয়, গুণেনের মা। আর মুখটা কেমন? চোখ নাক ঠোঁট?

কী জানেন, মনে হল কোনওটাই ঠিক জায়গায় নেই।

বউদিমণি চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, তার মানে? চোখের জায়গায় চোখ নেই?

না, মানে আছে, তবে দু চোখের মাঝখানে যেন অনেকটা ফাঁক।

এ মা, তা হলে তো বিচ্ছিরি। চোখ দুটো কি বড় বড়?

না না বরং চিনেম্যানদের মতোই যেন! আর নাক কেমন? থ্যাবড়া, বেশ থ্যাবড়া।

গালে হাত দিয়ে বউদিমণি বললেন, ও মা গো! নাক থ্যাবড়া! থ্যাবড়া নাকি চাপা?

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, না, থ্যাবড়াই। ঠোঁট কি পুরু? বেশ পুরু। যেন দুখানা পটল চেপে বসে আছে। দাঁত উঁচু নয়তো? উঁচু নয় বলেন কি? বিরাট উঁচু।

বউদি মুখে আঁচল দিয়ে হেসে ফেললেন, ধ্যাত, আপনি কোনও কাজের নন। অত কুচ্ছিৎ কেউ হতে পারে? মেয়েটা অত কুচ্ছিৎ নয়। হলে অত ভাল বিয়ে হচ্ছে কি করে?

মাথা চুলকে বললাম, তাও তো বটে। কিন্তু আমার তো বেশ কুচ্ছিৎ বলেই মনে হল!

উঃ, আপনাকে পাঠানোই ঘাট হয়েছে। আমাদের রান্নার ঠাকুর নন্দকিশোর মিশ্র মেয়েটিকে দেখেছে। সে বলছে বেশ ঢলঢলে দেখতে। বুঝেছেন? যে আজ্ঞে।

।।চার।।

মধুরিমা

হিরোর ঘুষির জোরে সত্যের জয় দেখে আমি আর গঙ্গা সিনেমা হল থেকে বেরোলাম। আর বেরিয়েই দেখি বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টির বল্লমে শরশয্যায় কলকাতা। লবিতে নাইটশোর ভিড় জমে ছিলই, ইভিনিং শোয়ের লোকেরা বেরিয়ে বৃষ্টির জন্য লবিতেই জমে যেতে থাকল। গরম, সিগারেটের ধোঁয়া আর ঠেলাঠেলিতে আমরা দুজন চিমসে হয়ে হয়ে অবশেষে দেয়ালে গিয়ে ঠেকলাম। চাপাচাপিতে দম বন্ধ হয়ে আসছে। কলকল করে ঘেমে ব্লাউজ ট্রাউজ ভিজে ঢোল হয়ে গেল।

এর মধ্যেই গঙ্গা চাপা গলায় বলল, এই গানটার জন্যই ছবিটা আর একবার দেখতে হবে।

আমি আঁচলে গলার ঘাম মুছতে মুছতে বিরক্ত হয়ে বললাম, মোটে একবার? তুই আরও কতবার যে দেখবি তার ঠিক নেই।

গঙ্গা একটু হাসল। সিনেমার মায়াঞ্জন এখনও ওর চোখে লেগে আছে। চাউনিতে ঘোর, হাসিতে বিভোরতা। আমার কিছুতেই সিনেমা দেখে ওর মতো হয় না। গঙ্গা একদম মজে যায়। আমাদের পিছনের সিটে বসে একটা ছেলে সিনেমার গল্পটা আগে আগে বলে দিচ্ছিল, এবার এই হবে, এবার সেই হবে। আছে ওরকম অনেকেই, যারা ব্যাপারটাকে খুব কৃতিত্ব বলে মনে করে। গঙ্গা এমনিতে নিরিহ হলে কী হয়, সিনেমায় বাঁধা পড়লে বাঘিনী। গঙ্গা প্রথমটায় ছেলেটাকে একটা ধমক দিয়েছিল। তাতেও কাজ না হওয়ায় হঠাৎ উঠে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, আর একটাও কথা বললে হল থেকে বার করে দেব। গঙ্গার সুবিধে হয়ে গেল আশেপাশের লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটার ওপর রুখে ওঠায়। ছেলেটা মিইয়ে গেল। এমনকি অর্ধেক ছবি দেখে উঠেও গেল।

আমাদের বাড়িতে একটা সস্তা ট্রানজিস্টর রেডিও আছে বটে, কিন্তু টিভি নেই। রেডিওটাই আমাদের যা-কিছু আমোদ প্রমোদ। সেটাও মাঝে মাঝেই খারাপ হয়ে যায়। পাড়ার বিশুদা বলে একজন সেটা কম পয়সায় সারিয়ে দেয়। কিন্তু এই কেবল

টিভি-র যুগে ট্রানজিস্টর নিয়ে কে মেতে থাকবে? সুতরাং আমার মা আর টুসি আশেপাশের বাড়িতে গিয়ে সিরিয়াল বা সিনেমা দেখে আসে। কিন্তু আমার কখনও ইচ্ছেটা হয় না। সাজানো গল্প, বানানো ডায়লগ, নকল প্রেম বা ঘৃণা, বিরহ-মিলন সবটাই পন্ডশ্রম মনে হয়। জনগণের আফিং।

নাইটশোর লোকেরা হলে ঢুকে গেছে আর ছাতাবান, গাড়িবান ইভিনিং শোর কিছু দর্শক কেটে পড়েছে। বৃষ্টি থামবার লক্ষণ নেই দেখে দু-চারজন ভিজে ভিজেই রওনা হয়ে গেল। হলে লরির ভিড় পাতলা, সহজে শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে।

গঙ্গা বলল, তোর সঙ্গে যেদিনই সিনেমাই যাই, ঠিক বৃষ্টি হয়।

বৃষ্টির সঙ্গে আমার সাট আছে।

গঙ্গা হি হি করে হেসে বলল, থাকা বিচিত্র নয় বাবা, মনে হয় ভগবান তোর সব কথাই শোনে।

কি করে বুঝলি?

দেখছি তো! তুই যা চাস তাই হয়ে যায়।

যদি এখনই একটা গাড়ি চাই বাড়ি পৌঁছানোর জন্য, দেবে?

চেয়েই দেখ না!

হেসে বললাম, বেশ। চাইলাম।

বাইরে বৃষ্টির তোড় আরও বেড়েছে। গঙ্গা শঙ্কিত চোখে বৃষ্টির দিকে চেয়ে বলল, ভাল করে চা।

ফের হেসে বললাম, গাড়িটা একটু বড় চাওয়া হয়ে গেছে। বরং ছোট করে দুটো লেডিস ছাতা চাই, কী বল?

গঙ্গা মাথা নেড়ে বলে, উঁহু, ছাতায় হবে না। যা হ্যাঁচলা আসছে ছাতা উড়িয়ে নেবে। গঙ্গা কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখল। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা, তুই তো একদিন কানাডার হাইওয়েতে গাড়ি চালাবি। মার্সিডিজ বেনজ বা বি এম ডবলু।

ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ আমার একটু মায়া হল। শুধু বাপের টাকার জোরে ওর বিলেত আমেরিকার পাত্র জুটবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার জুটেছে বলে তেমন খুশি হতে পারছি না কেন? কল্পনার চোখে আমি মিনিট খানেক কানাডার মস্ত চওড়া রাস্তায় গাড়ি চালিয়েও এলাম। তেমন ভাল লাগল না তো!

বললাম সেটাই কি ভাল লাগবে? তখন হয়ত একঘেয়ে লাগবে, একা লাগবে, কলকাতার জন্য বুক হু-হু করবে।

আহা তা করলেই বা! কিন্তু কত আরাম বল তো!

কী জানি কানাডার কথা ভেবে আমার তেমন কিছু আনন্দ হয় না।

তোর কপালে কষ্ট আছে, বুঝলি? ওরকম ঘ্যামা বর পেয়েও গাল উঠছে না, তোর কী হবে বল তো!

সেইটাই তো বসে বসে রোজ ভাবি। আমার যে কী হবে!

খিমচে দেওয়াটা গঙ্গা স্বভাব। এ কথায় এমন চিমটি দিল আর আমি 'উঃ' করে উঠলাম যে আশেপাশের লোকজন চমকে উঠে আমাদের দেখতে লাগল। কী খিলখিল হাসি আমাদের।

বৃষ্টিতে ভেজেচুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে কলকাতা। বৃষ্টি পড়ছে টরেন্টোয়, প্যারিসে নিউইয়র্কে। একশো বছর ধরে বৃষ্টি হোক। ডুবে যাক ভেসে যাক সব কিছু।

গঙ্গা বলল, ইস, মা চিন্তা করবে। পৌনে দশটা বাজছে। চল, ভিজে ভিজেই চলে যাই।

চল।

বৃষ্টিতে নামতেই প্রথমে গা সিরসির। লজ্জাহীন বৃষ্টির আঙুল মুখে, বুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে শরীর, বৃষ্টির জল শরীরের অলিতে গলিতে সোল্লাসে আবিষ্কার করছে আমাকে। আর বাতাসের দমকা ঝাপটায় ভেজা শরীর চমকে চমকে উঠছে শীতে।

গঙ্গা বলল, চুল শুকোবে না, দেখিস।

অত ভেবে কী হবে।

ট্রাম বন্ধ বাসে সাংঘাতিক ভিড়। কলকাতায় মাঝে মাঝে আমরা এমন বিপদে পড়ে যাই যে আজকাল মনে হচ্ছে, কানাডাই ভাল। শেষ অবধি অবশ্য কলকাতাতেও সকলেই ঘরে ফিরে আসে। কেউ আগে, কেউ একটু পরে। আমরাও ফিরলাম।

ঘি নেই, গরম মসল্লা নেই, কম ডাল দিয়ে রান্না, তবু বেশ লাগল মায়ের হাতের খিচুড়িটা খেতে। শোয়ার সময় টের পেলাম টাগরা জ্বালা করছে, নাক সুলসুল আর শরীরে থিরথির একটা মৃদু সঙ্কেত।

টুসি বলল, দিদি, তোর গা কিন্তু গরম।

জানি। সে আসছে।

চুলও শুকোয়নি তোর, কী হবে?

সে সমস্ত শরীর জুড়ে সেতারের ঝংকার তুলে। মাথায় টুপ টুপ করে তার দুষ্টু থাবা, কনুই হাটু, কবজি চিবোয় নরম দাঁতে। এক দয়ালু বাঘের মতো সে খুব যত্ন করে খায় আমাকে। জ্বালাভরা চোখ খুললে মেঘলা দিনের আলো-আঁধারিত ভরা ঘরখানাও কত মায়াবী দৃশ্য রচনা করে দিতে থাকে।

উঃ মা গো? আর কত যন্ত্রনা দেবে আমাকে?

কেন, তোমার ভাল লাগছে না?

ভাল লাগার কথা বুঝি?

দ্বিচারিণী

এমন ভালবাসা কোনও পুরুষ বাসতে পারবে? বলো? তোমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমার সঞ্চার। এত মেশামেশি, এত এক হয়ে যেতে পারবে কেউ?

তুমি মোটেই প্রেমিক-পুরুষ নও

তা হলে কী?

তুমি ধর্ষণকারী।

মাঝে মাঝে তোমারও কি ইচ্ছে করে না ধর্ষিতা হতে?

সেটা পাগুলে ইচ্ছে। ওরকম পাগলামি আমার কত হয়। তা বলে সেগুলো কি ভাল?

খারাপও নয় কিন্তু। এই যে তোমার চারদিকে একটা মাপা জগৎ, কি এমন আছে এখানে? মনের মধ্যে যে পাগল থাকে সেই তো উল্টোপাল্টা রং লাগায়, চিত্রবিচিত্র করে রোজ দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দেয়।

পাগল কি আর সব পারে গো? সে কি পারে আমার এই শীতল বুকে ঝড় তুলতে? পারলে আমি কেন এত চেষ্টা করেও একজন পুরুষকে ভালবাসতে পারছি না বলো!

তুমি চেয়েছিলে একজন লুটেরা পুরুষ। সে তোমার যতকিছু লন্ডভন্ড করে দেবে। সে তো তেমন নয়। সে ভীষণ ভদ্র, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে, দুরত্ব রাখে। তাকে তোমার পছন্দ হওয়ার কথা নয়।

তাই তো আমার জ্বালা।

জ্বালাও ভাল। জ্বালার ভিতরেও কত স্বাদ আছে।

তুমি বললেই তো হবে না। যার জ্বালা সে বোঝে। আমার কত জ্বর বল তো!

অনেক। গা পুড়ে যাচ্ছে তোমার দুই চোখ লাল। সমস্ত শরীরে ব্যাথার মৃদঙ্গ। কী ভাল লাগছে তোমাকে এখন!

ঘোরের মধ্যে আমি হাসি, তোমার থাবার মধ্যে পড়ে থাকলেই শুধু আমাকে তুমি সুন্দর দেখ। আর কোনও সময়ে নয় বুঝি?

না। বেশ তো মজা!

হ্যাঁ, বেশ মজা।

আমি তোমাকে ধীরে ধীরে খাচ্ছি। খুব ধীরে ধীরে তোমার সত্তা আর শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছি। বেশিক্ষণ তো নয়। তোমাকে ছেড়ে আমাকে তো চলেই যেতে হবে। যতক্ষণ আছি আশ মিটিয়ে নিতে দাও।

হাসি, হেসে বলি, তাহলে আশ মিটিয়ে নাও।

জ্বর বাড়ে। ঝিমঝিম এক রুপকথা জগতেই চলে যাই যেন।

টুসি এসে সকালে গায়ে হাত দিয়ে বলল, বাঃ, তোর গা একদম ঠান্ডা, জ্বর নেই।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল কি?

হাসি হাসি মুখ করে টুসি বলল, একটা দারুন খবর আছে।

কী খবর?

সুজিতদার মা আর বাবা তোকে দেখতে আসছে।

অবাক হয়ে বলি তাই নাকি?

হ্যাঁ তো। আজ সকালের ট্রেনেই এসে পৌঁছবে।

তোকে কে বলল?

শেফালী বউদির বাড়িতে গিয়েছিলাম কাল সন্ধেবেলায়। তখনই বলল। তোর ভয় করছে না?

হেসে বললাম, ভয়ের কী?

বাবা রে বাবা! শুনে অবধি আমারই কেমন ভয় ভয় করছে। যদি আবার তাদের পছন্দ না হয়!

তা হলে তো ভালই। তোদের ছেড়ে আমাকে দূর বিদেশে যেতে হবে না।

ধ্যেত। আমি বলে কবে থেকে আশা করে বসে আছি!

কীসের আশা?

তুই কানাডায় যাবি আর বছরখানেকের মধ্যে আমাকেও নিয়ে যাবি।

উঃ, কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে বল তো?

মনে মনে এই একটা কথা ভেবেই আমার কানাডায় যেতে ইচ্ছে হয়। যদি যাই তাহলে আমি ওখানে কিছু করব। তখন বাবাকে কিছু সাহায্য করা যাবে হয়ত। টুসিটাকে নিয়ে যাব নিজের কাছে। পড়াশুনোয় টুসি বেশ ভাল। হয়ত ওখানে ওর একটা কেরিয়ার তৈরি হতে পারবে।

বললাম, সুজিতকে তোর কেমন লাগে?

দারুণ! কী ভদ্র, কী ভাল। আর অমিতাভ বচ্চনের মতো লম্বা।

ও বাবা তুই তো দেখছি প্রেমে পড়ে গেছিস!

যাঃ! বলে সে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

তোর খুব টেনশন হচ্ছে, না রে? যদি পছন্দ না করে?

টুসি মুখ টিপে হেসে বলল, হচ্ছে না? তারা আবার রাগী মানুষ কিনা কে জানে বাবা?

রাগী হলে?

আমি রাগী মানুষদের ভয় পাই।

আমিও পাই।

শেফালী বউদি বলছিল, ওরা এসে তোকে একেবারে আশীর্বাদ করে যাবেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, কী আর করা যাবে।

উঃ, আশীর্বাদটা হয়ে গেলে বাঁচি।

কেন বলো তো!

আশীর্বাদ হয়ে গেলে আর বিয়েটা ভাঙবে না, তাই না?

সেই জন্যই তোর টেনশন?

হ্যাঁ, তো! কিন্তু তুই ঠিক এ সময়ে জ্বর বাধিয়ে বসে চেহারাটা খারাপ করে ফেললি যে। তাই টেনশন হচ্ছে।

আমার চেহারাটা তো এমনিতেই খারাপ। তার চেয়ে আর কী খারাপ হবে?

ধ্যেত। সবাই বলে তোর নাকি দারুণ পারসোন্যালিটি। সুজিতদা তোকে তো আর এমনি এমনি পছন্দ করেনি। কত ভাল ভাল পাত্রীর খবর ছিল ওদের কাছে।

শেফালী বউদি বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ তো।

টুসি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। ওর মুখখানা দেখলেই বোঝা যায় বড় হয়ে ও খুব সুন্দরী হবে। বোনটার জন্য আমার বড় মায়া। এখন অবধি দিদিই ওর ধ্যান। ওকে ছেড়ে যেতেই আমার কষ্ট হবে বেশি।

তুই উঠে পড় দিদি। তৈরি হতে থাক।

অবাক হয়ে বলি, কিসের তৈরি?

তোকে যে ভীষণ রুখু-রুখু লাগছে। চুলগুলো কী হয়ে আছে বাবা। রোগাও হয়ে গেছিস। কী যে হবে!

খুব হাসলাম, বললাম সবে তো জ্বর ছেড়েছে। শরীর ভীষণ দুর্বল। এখনই কি হুড়যুদ্ধ করতে পারি? অত অস্থির হোস নে। পছন্দ যদি না করে নাই করবে। আমরা তো বেশ আছি।

না না, ওঠ। আমি তোকে ধরে তুলছি।

বাধ্য হয়ে উঠে বসলাম। বেশ বেলা হয়েছে। আমাদের টেবিল ঘড়িতে সাড়ে আটটা।

মায়ের চোখেমুখেও বেশ টেনশন। আমাকে দেখেই বলে উঠল, সব শুনেছিস?

কী মা?

ওঁরা নাকি আজই এসে পৌঁছোচ্ছেন।

তাতে কী?

ওমা! কত বড় মানুষরা আসছে আমাদের তো কোনও আয়োজনই নেই।

কীসের আয়োজন?

ঘরদোর গোছনো, ভাল মিষ্টিটিষ্টি আনা। তোর বাবাকে তো বলেছি, এখন কী করে দেখ। তার ওপর এমন কপাল, ঠিক এই সময়টাতেই তোর জ্বর হল। কেন যে সেদিন বৃষ্টিতে ভিজতে গেলি!

অত ভেব না।

ভাবব না? বলিস কি? ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, এখন তীরে এসে তরী না ডোবে। আমাদের যা কপাল!

ভগবান মুখ তুলে যদি চেয়েই থাকেন তাহলে তোমার তরী ডোবায় কার সাধ্য? ভগবানের ওপর তোমার বিশ্বাস নেই মা?

তা আছে বাপু। গরিবের তো ভগবানই ভরসা। দেখি মুখখানা। দেখ। তোমার প্যাঁচা, হাড়গিলে মেয়েকে ভাল করে দেখে নাও। দেখন-সুন্দরী না হতে পারিস, তোর মতো অমন ঢলঢলে মুখ ক'জনের আছে! একটু শুকনো দেখাচ্ছে ঠিকই, তেল দিয়ে চুল বাঁধলে ওটুকু ঢেকে যাবে। বরং জল গরম করে দিই, একটু চান করে নে। সর্দি জ্বরে বড্ড কাহিল করে ফেলে। দেখি গা।

মা কপালে হাত রেখে আপন মনেই বলল, না জ্বর নেই বাবা।

জ্বর না থাকলেও কাশি আছে। শরীর বেশ দুর্বল। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে আমার বিশেষ পছন্দ হল না। ওঁরাও যদি পছন্দ না করেন তাহলে টেনশন থেকে বাঁচি।

বাবা বাড়ি ফিরে ঘোষণা করল, ওঁরা বিকেলেই আসছেন।

মা বিপন্ন মুখে বলল, তাহলে কী ব্যবস্থা হবে? বাবা বেশ নার্ভাস। বলল, মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেব, আর কি?

মা মাথা নেড়ে বলে, বাজারের বেড়ে দেওয়াটা ভাল দেখায় না। বরং একটু লুচি-টুচি করলে হত। সঙ্গে আলুর দম আর মিষ্টি। তা করতে পারো। তবে ওরা কি আর ওসব মুখে তুলবেন?

আর শোনো, একটু ভাল চা-পাতা আনতে হবে। আমাদের বাড়ির যা চা ও শুধু আমরাই খেতে পারি।

চাও আনা যাবে।

আমাদের গরীব সংসার দেবদূতদের আগমনের জন্য তৈরি হতে লাগল। গঙ্গাদের বাড়ি থেকে একটা ভেলভেটের জমকালো বেডকভার চেয়ে আনল টুসি। মলিন ঘরে সেটা বিকট দেখাতে লাগল। আমি বললাম, টুসি, ওটা তুলে ফেল। কেন রে দিদি? ওটা দেখেই বুঝবে যে ধার করা জিনিস।

তার চেয়ে বিছানার ওপর মাদুর পেতে দে বরং, খারাপ দেখাবে না। কি যে বলিস। কেমন সুন্দর বেডকভারটা।

সে তো ঠিকই। অত সুন্দর বেডকভার কি এঘরে মানায়? তোর চোখ নেই?

টুসি বয়েস কম হলেও বুদ্ধি কম নয়।

একটু বেড কভারটার দিকে চেয়ে থেকে বলল, ঠিক বলেছিস। তুলেই ফেলি। মা এক কাপ দুধ নিয়ে এসে আমাকে খাওয়ানোর জন্য জোরাজুরি করতে লাগল। জন্মে আমরা দুধ খাইনা। বললাম, মা, এবেলা দুধ খেলেই কি ওবেলা আমার রুপ খুলে যাবে? দুধ নয়, বরং আদা দিয়ে গরম চা দাও এককাপ, তাতে একটু গলাটা ছাড়তে পারে।

খবর পেয়ে গঙ্গা বড় বড় চোখ করে ছুটে এল। বগলে তর গত বারের পুজোয় কেনা দারুন সন্দর বমকাই শাড়ি। শুনেছিলাম চার হাজার টাকা দাম। বলল, আজ এটা পরে আশীর্বাদ নিতে হবে তোকে।

অন্যের শাড়ি পরতে এমনিতেই আমার ঘিনঘিন করে। তার ওপর অত দামী শাড়ি। বললাম, শোন, এটা তো আর বিউটি কনটেষ্ট নয়। আমি অত সাজব কেন?

চোখ আরও বড় করে গঙ্গা বলে, সাজবি না! সে কী রে!

শোন সুজিত যখন আমাকে পছন্দ করেছিল তখন আমার পরনে ছিল মেটে রঙের সালোয়ার-কামিজ যেটা কদিন পরেই ঘর মোছার ন্যাতা হয়ে যেত। আর মুখে ছিল কসমেটিসের বদলে ঘাম। তাতেই যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আর সাজতে যাব কেন?

গঙ্গা জবরদস্তি করল না। জানে করে লাভ নেই। শুধু করুণ গলায় বলল, হ্যাঁ রে, তোর আশীর্বাদের সময় আমি যদি কাছে থাকি তাহলে দোষ হবে?

অবাক হয়ে বলি, দোষ হবে কেন? কেউ থাকলে বরং আমি একটু জোর পাব।

কি রকম সাজাবি?

একটুও সাজব না। ওঁরা জানেন, আমরা গরিব। বেশি সাজলে ওঁরা আড়ালে হাসাহাসি করবেন হয়তো। সাজ নয়, পরিচ্ছন্নতাটাই আসল। তোর সত্যিই খুব সাহস।

সাহস নয় রে, কমনসেন্স। নিজের অবস্থা লুকোতে চাইলেই গণ্ডগোল বাধে।

আদা দিয়ে চা খাওয়ার সময় হঠাৎ খুব হাসি পেল। সেই টুলু ছেলেটা না বলেছিল, গরিবের বাড়ির চায়ে একটা বিটকেল সোঁদো-সোঁদো গন্ধ হয়। গঙ্গা বলল, হাসছিস কেন রে?

একটা কথা মনে পড়ল, তাই, কত কথাই যে হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে আর হাসি পেয়ে যায়। আচ্ছা, তুই কি কম্পিউটার শিখে কানাডায় যাবি?

কানাডায় যাওয়া হবে কিনা আগে দেখ। কী যে বলিস অলক্ষুণে কথা। আজ ন তোর আশীর্বাদ!

আশীর্বাদ মানেই তো আর বিয়ে নয়! আশীর্বাদের পরও কি বিয়ে ভেঙে যায় না?

গঙ্গা আমার হাতে একটা রাম চিমটি দিল যে গরম চা চলকে শাড়িতে পড়ে উরুতে ছ্যাঁকা, তারপর খুব হাসলাম দুজনে।

জ্বরে তোর চেহারাটা কিন্তু খারাপ হয়নি মধু।

হয়নি? সবাই যে বলছে শুকিয়ে গেছি।

মোটেই না। বরং সর্দির তাড়সে চোখমুখ একটু ভারীই লাগছে। ভয় করছে তোর?

না, খুব বেশি আশা করে থাকলে ভয় করত। আমার তা হলেও হয়, না হলেও হয়।

ফের একটা চিমটি দেব?

না রে, সত্যিই, কেন যে অত মেয়ের মধ্যে ছেলেটা আমাকেই পছন্দ করল সেটা আজও আমি মাথামুন্ডু বুঝতে পারিনি। আর আমার কোনও রিঅ্যাকশন হওয়ার আগেই তো বিয়ের প্রস্তাব চলে এল। এত তাড়তাড়ি সব হয়ে গেল যে আমার মাথাটাই পাগল-টাগল ভাল হল না মন্দ হল কে জানে!

উফ্, তুই বুঝছিস না এটা কত ভাল হল? তুই কী রে? কদিন পরই তো কোন সাতসমুদ্দুর পার হয়ে চলে যাবি ঘ্যাম একটা দেশে। কী ভাল থাকবি। তোকে সবাই হিংসে করছে। আর সুজিতবাবু কী ভাল বল একটু ফষ্টিনষ্টি করেনি। কাছে ঘেঁষেনি, বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বোকারো ফিরে গেছে।

হ্যাঁ, সে খুব ভাল ছেলে আমি জানি। আমিই ভাল নই।

মধু, তুই যে ভাল সেটা তুই ভাল জানিস।

শাড়ি নিয়ে দুপুরে মায়ের সঙ্গে একচোট হল। আমরা গরিব হলেও দু-তিনখানা চটকদার কাপড় আমারও আছে। তার মধ্যে একটা লাল এবং জমকালো। মা সেটা পরার জন্য মাথা কুটোকুটি। আমি রাজি হলাম না। আমার পছন্দ একটা লালপেড়ে সাদা খোলের শাড়ি। মৃন্ময়বাবু নামে এক ভদ্রলোক তার মাতৃশ্রাদ্ধে বাবাকে দিয়েছিলেন। মা কিছুতেই সেটা পরতে দেবে না। না না, ওটা শ্রাদ্ধের শাড়ি। ওটা পরে নাকি কেউ আজকের দিনে?

আমি বললাম, শ্রাদ্ধ তো আর শাড়ির গায়ে লেখা নেই। শাড়ি শাড়িই। তার বেশি কিছু নয়। উপলক্ষটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

মাকে হার মানতে হল।

দুপুরে আবার একচোট হল খাওয়া নিয়ে।মা বেশি করে ঠুসে ঠুসে খাওয়াতে চায়। আমি বললাম, একেই আমার জ্বরের পর অরুচি, নাক বন্ধ বলে গন্ধ-বাস পাচ্ছি না। খাইয়ে ফের অসুস্থ করে তুলতে চাও নাকি?

মা নিরস্ত হল।

দুপুরে খাওয়ার পর কাহিল শরীরে ভিতরের ঘরে মা বাবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাইরের ঘরটা টুসি আর ওর পাড়ার দুজন বন্ধু মিলে সাজাচ্ছে। সাজানো আরকি! একটা ফুলদানিতে কিছু ফুল এনে রেখেছে। যা খুশি করুক।

মা মহা ব্যস্ত আলুর দম আর লুচির আয়োজন করতে। আজ এ বাড়িতে ঘি এসেছে, ময়দা এসেছে, গরম মশলা এসেছে। ভাল দোকানের মিষ্টি এসেছে। যা ইচ্ছে হোক।

আমার ঘুম এল। বেশ গাঢ় ঘুম।

চারটে নাগাদ মা এসে ঠেলে তুলল, ওরে, ওঠ, ওঠ! ওঠ! ওঁরা যে এসে পড়বেন। তৈরি হয়ে নে।

গড়িমসি করে উঠলাম। জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে আর একটা পর্বের চৌকাঠে আমার পা। নিজেদের দীনহীন ঘরদোরের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল, এমন কি খারাপ ছিলাম এখানে? একটু টানাটানি, একটু কষ্ট, সামান্য অপমান ছিল বটে। কিন্তু খুব খারাপ কী?

টুসি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ওঘরে। খুব গর্বের সঙ্গে বলল, দেখ।

হেসে বাঁচি না। দুটো মঙ্গলঘট বসিয়েছে দরজার দু'পাশে। তাতে আম্রপল্লব, দেয়ালে কোথা থেকে এনে চাঁদমালা ঝুলিয়েছে। ফুলদানিতে কাগজফুল। বিছানায় মাদুরই পেতেছে বটে, কিন্তু আমাদের বাড়ির মাদুর নয়, কারও বাড়ি থেকে একটা চকরা বকরা নাইলনের মাদুর ধার করে এনেছে।

পছন্দ হয়নি তোর?

হাসতে হাসতে বললাম, খুব সুন্দর।

না, তুই হাসছিস।

খুশি হয়ে হাসছি।

সত্যি?

হ্যাঁ রে, সত্যি।

আচ্ছা বাবা আজ দাড়ি কামিয়েছে?

জানি না তো!

ইস বাবা তো তিনদিন পর পর দাড়ি কামায়। আজ বাবার দিন নয়! এমা, যদি না কামায় তাহলে কী হবে?

ওর মুখের ভীষণ দুশ্চিন্তা দেখে আমি প্রায় হেসে গড়িয়ে পড়ি।

টুসি ছুটল বাবাকে খুঁজতে।

বাবা অবশ্য বেশিদূর যায়নি। পাড়ার কোন দোকান থেকে হিং আর তেজপাতা আনতে গিয়েছিল। টুসি যখন ধরে আনল তখন দেখা গেল, বাবার দাড়ি দিব্যি কামানো। খুব একচোট হাসাহাসি হল।

টুসি বলল, আর কী বাকি রইল বল তো!

কিছু না। এই তো বেশ ঘর সাজানো হয়েছে।

টুসি তবু খুঁতখুঁত করে বলল, তোর ড্রেসটা নিয়ে ভাবছি। লালপেড়ে শাড়ি কি ভাল হবে?

আমার তো ভালই মনে হচ্ছে। ভাল না হলেও অভিনব। আর এটা অভিনবত্বের যুগ। যদি ওঁরা বুঝতে পারেন তো ভাল।

টুসি আমার দিকে একটু চেয়ে খুঁটিয়ে আমার মুখটা দেখে নিয়ে বলল, তোকে রোজকার মতোই দেখাচ্ছে। অসুখ হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে না। শুধু ওঁদের সামনে বেশি নাক টানিস না।

পাঁচটার একটু পরেই ওঁরা এলেন। সুবীরদা, শেফালী বউদির সঙ্গে একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক আর একটু কালো এবং তত সুন্দরী নন গোছের এক ভদ্রমহিলা, যার পরনে বেশ দামি ঝলমলে বালুচরী সিল্ক। আমাদের গোটা বাড়ি তটস্থ। পর্দার ফাঁক দিয়ে টুক করে দেখে নিয়ে গঙ্গা ফিসফিস করে আমাকে বলল, ভদ্রমহিলা একটু দেমাকি মনে হচ্ছে। কিন্তু ভদ্রলোকটা বেশ ভাল।

আমি শুধু হাসলাম। আমার এসব নিয়ে চিন্তা নেই। শ্বশুর বা শাশুড়ি নয়, হবু বর নয়, আমার চিন্তা নিজেকে নিয়ে। বিয়ে এগিয়ে আসছে, আমার ভিতরে কোনও তরঙ্গ নেই কেন? এত নিথর কেন বুকটা? আনন্দের লেসমাত্র টের পাই না কেন কখনও?

এই নিরুত্তাপ মুখ নিয়েই আমি গিয়ে ওঁদের প্রণাম করে সামনে বসলাম। আমার রূপ এমন নয় যে ওঁরা ট্যারা হয়ে যাবেন। তা ওঁরা হলেনও না। শুধু ভদ্রলোক নরেন্দ্রবাবু সামান্য সাধুবাদ দিলেন, বাঃ মুখখানা তো ভারি মিষ্টি!

ভদ্রমহিলা কোনও মন্তব্য করলেন না। হুঁ হাঁ পর্যন্ত না। তবে তাঁর চোখ আমার ওপর দারোগার মতো ঘুরছিল। ছেলে কী দেখে এই মেয়ে পছন্দ করল সেই রহস্যের সমাধান মনে হয় তিনি পেলেন না।

নরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বললেন, তুমি কিছু বলো।

ভদ্রমহিলা শান্ত কঠিন কণ্ঠে বললেন, কী বলব?

আরে, পাত্রী দেখলে কিছু বলবে না?

তুমি চুপ করো তো!

নরেন্দ্রবাবু চুপ করে গেলেন।

সুবীরদা হঠাৎ বললেন, মধুরিমা এ পাড়ার সবচেয়ে ভাল মেয়ে। সবাই ওর প্রশংসা করে। আড্ডাবাজ নয়, বাচাল নয়। স্বভাব ভারি ভাল।

শেফালী বউদিও সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, ও অন্য রকম।

তবু ভদ্রমহিলা তার কঠিন নীরবতা ভাঙলেন না। সেটা বেশ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে মা লুচিটুচি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ায় পরিস্থিতিটা সামান্য সহজ হয়ে গেল। লুচি ইত্যাদি নিয়ে আপত্তি উঠল যথারীতি। খাব খাব না করেও ভদ্রতা রক্ষায় একটা দুটো খাওয়া হল। তারপর চা।

নরেন্দ্রবাবু বললেন, তা হলে এবার শুভ কাজটা সেরে ফেলা যাক, কী বলো?

ভদ্রমহিলা শুধু বললেন, সারতেই তো আসা।

শঙ্খধ্বনি, ধান-দুর্বো ইত্যাদি সহযোগে ওঁরা একটা সোনার চেন দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

আমার ভিতরটা তেমনই নিথর রইল।

কিছু মামুলি কথাবার্তার পর ওঁরা চলে গেলে হাঁফ ছাড়লাম। মায়ের চোখে আনন্দাশ্রু, বাবা বিহ্বল, গঙ্গা বোকার মতো কেবল হাসছে, টুসির মুখে চাপা উত্তেজনা।

গঙ্গা বলল, বলেছিলাম না শাশুড়িটা দেমাকি?

উদাস গলায় বললাম তা হবে হয়তো।

তবে তোর শ্বশুরটা ভাল। কত বড় চাকরি করে, অত বড় ইঞ্জিনিয়ার একটুও অহঙ্কার নেই। চারটে লুচি খেয়েছে।

হেসে ফেলে বললাম, যাঃ! লোকের খাওয়ায় নজর দিতে নেই।

নজর দিইনি। বলছিলাম যে বেশ সাদামাটা লোক। অনেকে খাওয়ার মধ্যে স্টাইল দেখিয়ে একটুখানি খায়। এই ভদ্রলোক তা নয়। আলুর দমটা তো চেটেপুটে খেয়েছে মিষ্টিও।

তাহলে দেখিস ঠিক ব্লাড সুগার আছে। সুগারের রুগিদের খুব মিষ্টির ওপর ঝোঁক।

না রে, লোকটা ভাল।

পরদিন গঙ্গা খবর আনল, জয়া দেবী-অর্থাৎ আমার হবু শাশুড়ির নাকি আমাকে অপছন্দ নয়। তবে বলেছেন, রংটা আর একটু ফর্সা হলে ভাল হত।

তা হলে পাস করে গেছি বলছিস?

লেটার মার্কস। আচ্ছা, ওদের কেমন লাগল বললি না?

খারাপ কি?

আহা জোরে কাশ না বাবা!

ভালই তো।

না, চিমটি কাটলে তোর পেট থেকে কথা বের করা যাবে না।

রক্ষে কর ভাই, পেটে কোনও কথা নেই। আসলে ওঁদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি।

শুধু সুজিতবাবুকে নিয়ে?

তাও নয় আমার সমস্যা নিজেকে নিয়ে। মনে হচ্ছে, আমার নিজের ইচ্ছেয় তো আর এসব হল না! একজন পছন্দ করে ফেলল বলে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমার কোনও ভূমিকাই নেই। এসব নিয়েই ভাবি। আর শ্বশুর-শাশুড়ির কথা বলছিস? কোন মেয়েরই বা শ্বশুর-শাশুড়ি পছন্দসই বল! ওসব মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়।

বাবা সকালে পুজো করতে গিয়েছিল। ফিরল উত্তেজিত হয়ে। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে বলল, কী কাণ্ড! ওগো কোথায় তোমরা! কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড শুনে যাও।

মা তো ভয় পেয়ে উদ্বিগ্ন মুখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল, কী হল গো?

বাবা উজ্জ্বলমুখে একগাল হেসে বলল, ওঃ সে যা কাণ্ড, ভাবতেই পারবে না।

মার উদ্বেগ যায় না, ভাল খবর তো! আমার যে বুক ফাঁপছে!

ভাল মানে? সাঙ্ঘাতিক ভাল। বউরানি মধুকে আইবুড়োভাত খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছে।

মায়ের মুখেও যেন আলো জ্বলে উঠল, অ্যাঁ! বলো কী!

দুজনের এই কাণ্ড দেখে আমার হাসি পায়। বাবার একটা দাস মনোবৃত্তি আছে। মধুসূদন দত্তরা বড়লোক বটে, কিন্তু আমাদের মাথা তো কিনে নেয়নি। নিত্যপুজো করে বাবা সে বাড়ি থেকে মাত্র দেড় বা দুশো টাকা প্রতি মাসে পায়। কিন্তু তাইতেই বাবার একটা বিগলিত ভাব। যেন তারা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমার একটুও ভাল লাগে না।

বাবা এখন উত্তেজিত। চেয়ারে বসে বড় বড় চোখে চেয়ে মাকে বলে, উঃ! সে কী কাণ্ড! পুজো করে ঠাকুরঘর থেকে সবে বেরিয়েছি।, টুলু এসে বলল, বউরানি ডাকছেন। একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম ঠিকই, কে জানে কোনও ভুলত্রুটি হল কিনা। আমাদের তো পুঁটিমাছের প্রাণ! তা গিয়ে দেখি, বউরানি হাসি-হাসি মুখেই বসা, পাটভাঙা গরদের শাড়ি, এক গা গয়না, জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ। তা বললেন, ঠাকুরমশাই, আপনার মেয়ের এত ভাল বিয়ে হচ্ছে, বিলেত ফেরত পাত্র পেয়েছেন, এতে আমাদেরও তো আনন্দ, কী বলুন! আমি বললাম, সবই তো ঠাকুরের দয়া আর পাঁচজনের আশীর্বাদ। তারপর বললেন, মেয়ে তো অনেক দূর দেশে চলে যাবে

শুনলাম, শুনে অবধি বড় মায়া হচ্ছে। মেয়েদের কী জীবন বলুন, পরের ঘর করতে কোথায় কোথায় চলে যেতে হয়। আমি বললুম, সে তো ঠিকই। আপনারা মায়ের জাত বলেই সয়ে বয়ে নিতে পারেন, পরও আপন হয়ে যায়।

মা একটু ধৈর্য হারিয়ে বলল, আহা, আসল কথাটা বলো না।

বাবা হাত তুলে বলল, বলছি। এইসব কথার পর বউরানি খুব নরম গলায় বললেন, আমার একটা আবদার আছে ঠাকুরমশাই। আমি আপনার মেয়ে মধুরিমাকে আইবুড়োভাত খাওয়াব। যদি অনুমতি দেন। শুনে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তা বললাম, এ তো পরম সৌভাগ্য। পঁচিশ বছরের সম্পর্ক এ বাড়ির সঙ্গে, সে তো আর এমনি নয়। বুঝলে, চোখে একটু জলও এসে গিয়েছিল।

মাও ছলছলে চোখে বলে, তা তো হবেই। আর কি বলল?

বাবা আহ্লাদের সঙ্গে বলল, আরও আছে। শোনই না। বউরানি বলল, মধুরিমা তো একা আসতে পারবে না। তা আমি টুলুকে পাঠাব। বাড়ির গাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে, ফের পৌঁছে দেবে।

মার চোখ এত বড় বড় হয়ে গেল, বলো কী গো! গাড়িও পাঠাবে?

বাবা গ্যালগ্যাল করে হাসছে, সেই কথাই তো বলছি। আমি একটু না না করলুম বটে, কিন্তু বউরানি শুনলেন না। বললেন, আহা, এটা আর এমন কি? ক'দিন পরে মধুরিমা তো নিজেই বিলেতে গাড়ি চালিয়ে বেড়াবে। বলেছে?

বিবরণ শেষ করে বাবা কল্পচক্ষে একটা স্বপ্নের ছবি দেখতে দেখতে বলল, ওঃসাঙ্ঘাতিক ব্যাপার।

মা আর বাবার এই ভিখিরিপনা দেখে একটু রাগ হল, একটু মায়াও হল, নন্দরানির নেমন্তন্ন পেয়ে ওরা যেমন খুশি, আমি তেমন খুশি হতে পারি না। বরং বিস্বাদ লাগছে। একেই কি জেনারেশন গ্যাপ বলে? বড়লোকদের প্রতি এমনিতেই বাবা শ্রদ্ধামীল এবং ভয়ভীতিসম্পন্ন। তার ওপর বাবা ও-বাড়িকে অন্নদাতা, মনিবের বাড়ি বলে ভাবে। এরকম ভাববার কোনও কারণ নেই, কিন্তু ধারণাটা সহজে পাল্টে দেওয়া যাবে না। যখন ছোট ছিলাম তখন দু-চারবার পালেপার্বণে বাবার সঙ্গে ওবাড়িতে গেছি। তখন মধুসূদন দত্তর বাবা বুড়োকর্তা রাঘব দত্ত বেঁচে। মোটা থলথলে ফর্সা চেহারা, সাদা গোঁফ, শকুনের মতো তীক্ষ্ণ চোখ, তাঁর সামনে বাবার সে কী বিগলিত হেঁ-হেঁ ভাব।বাবার ওপর রাগ হত, কষ্টও হত। আর ওই দম-চাপা, বিশাল বাড়ির জিনিসপত্রে ঠাসা ঘরগুলোতে ঢুকলে কেমন যেন মন খারাপ লাগত। ক্লাস সেভেনে চার-বার গাড্ডু পাওয়া মধুসূদন তখন সদ্য যুবা। মিট মিট করে আমাকে দেখত। গোলগাল, ফর্সা, বোকা-বোকা মুখের মধুসূদনকে দেখলে আমার

খুব ইচ্ছে করত মাথায় গাঁট্টা মারতে। বুড়োকর্তা তখনই মধুসূদনের বিয়ের সম্বন্ধ করছিলেন। বাবা বি.এ পাস এক পাত্রীর সন্ধান দেওয়ায় বুড়ো কর্তা আঁতকে উঠে বলেছিলেন, ও বাবা! অত লেখাপড়া জানা মেয়ে এনে কি বংশের সর্বনাশ করব হে? একটু-আধটু লিখতে পড়তে পারলেই হল, আর নেদি বংশ। যতদূর জানি নন্দরানির বিদ্যে ক্লাস সিক্স অবধি। বাইরের জগৎকে প্রত্যাখ্যান করে ওরা বেঁচে আছে জমানো টাকা আর সুদের কারবারের ওপর। কিন্তু ধীরে ধীরে টাকার পাহাড় ক্ষয় হচ্ছে। প্রোমোটারদের আনাগোনা শুরু হয়েছে।

বাবার উত্তেজনা এখনও পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি বলল, কিছু দিতেটিতেও পারে, কী বলো?

মা বলল, খুব পারে। ইচ্ছে করলেই পারে। বউরানির নিজেরই তো বোধহয় হাজার ভরি সোনা আছে।

বেশি! বেশি! অনেক বেশি। গিন্নি মায়েরই তো দেড়-দু'হাজার ভরির গয়না ছিল। তা ছাড়া বন্ধকী গয়নার তো লেখাজোখা নেই। তবে কঞ্জুসও আছে। পাওনাগন্ডা মেটাতে বড্ড গড়িমসি করে।

বিয়ের জন্য যে ধারে চেয়েছিলে তার কি হল?

দেব-দিচ্ছি তো করছে। এখন দেখা যাক। দেবে মনে হয়?

দিতে পারে। তবে সুদ নেবে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তুমি এতকাল ধরে ওদের কুল-পুরোহিত, তা সত্ত্বেও সুদ নেবে?

সুদই যে ওদের লক্ষ্মী। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। তা নিক। ধীরে ধীরে শোধ দেওয়া যাবে। মাস-কাবারি পুজোপাঠের চাকরিটা তো আছে, ওটা থেকেই শোধ হয়ে যাবে।

মা শঙ্কিত হয়ে বলে,তারই বা ঠিক কী বলো। ওই যে টুলু ছোঁড়াটা ও-বাড়িতে গেড়ে বসে আছে সে নাকি তোমার চেয়েও ভাল পুজো করে, তুমিই তো বলছিলে! যদি সেই ছোঁড়াটাই কাজটা বাগিয়ে বসে!

বাবা হা হা করে হেসে বলে, আরে না না। অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে না? টুলু তো সেদিনকার ছেলে। তবে তার সংস্কৃত উচ্চারণটা বড্ড ভাল। আর সে ছেলের মনটাও খুব উঁচু। আমাকে ছাড়লে সে ও কাজ কিছুতেই নেবে না। প্রস্তাব তো একবার উঠেছিল। সে সাফ বলে দিয়েছে, পারবে না।

ভাল হলেই ভাল। আজকাল লোক চেনা মুশকিল!

এ সবই ছকে বাঁধা সংলাপ, ঘরে ঘরে আইবুড়ো মেয়েদের মা-বাপের মধ্যে আবহমানকাল হয়ে আসছে। গল্পে উপন্যাসে, নাটকে, সিনেমায় বা সিরিয়ালে

আমাদের বহুবার শোনা। তবু নিজের মা-বাবার মুখে শুনলে একটু কষ্ট হয়, সামান্য গ্লানিও হতে থাকে। সারাদিন কষ্টটা ডাক টিকিটের মতো বুকে সেঁটে রইল।

পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ, আমি যখন কলঘরে, হঠাৎ টুসির উল্লাস শুনলে পেলাম, ওই তো টুলুদা এসে গেছে!ও মা, অ্যাম্বাসাডার গাড়ি!

ইস! আমার যে কী লজ্জা করছে! বড্ড আদেখলে আছি আমরা। টুসিটা যেন কী! আর নন্দরানিরই বা হঠাৎ কী হল যে, আমার জন্য গাড়ি পাঠাতে গেল! এত ভাল তো ভাল নয়। আমার বাবা ওদের বাড়ির পুজারী বামুন, যাকে ওরা চাকরবাকরের বেশি মনে করে না। তার মেয়ের জন্য গাড়ি কেন বাবা! কোন চক্কর আছে ভিতরে কে জানে। ব্যাপারটা একদম ভাল লাগছে না আমার।

মা বারবার বলতে লাগল, ওরে, একটু সেজেগুজে যা। অত বড়লোকের বাড়িতে যাচ্ছিস। আমি হালকা নীল রঙের লালপেড়ে একটা শাড়ি পরতে পরতে বললাম, আমি কি সাজে বউরানির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব মা? ওসব চেষ্টা না করাই ভাল।

তবে সোনার হারটা পরে যা, আশীর্বাদে যেটা পেলি।

থাক মা, যেখানে যাচ্ছি শুনলে না সেটা সোনার খনি! সোনা দেখে দেখে বউরানির চোখ পচে গেছে। আমার পাথরের মালাই ভাল।

মা আর চাপাচাপি করল না। মা কোনও দিনই এঁটে ওঠে না আমার সঙ্গে।

গাড়িতে ওঠার সময় টুলু দরজা খুলে ধরে রইল। আমি ওঠার পর দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল, আমি বললাম আপনি পিছনে আসুন টুলুবাবু।

বাপ রে, তাও কি হয়! আপনি বউদিদি মনির অতিথি!

হীনস্মন্যতা আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি খুব জোরের সঙ্গে বললাম, না, আপনি আমার পাশেই বসুন। কথা আছে।

টুলু বসল খুব সঙ্কোচের সঙ্গে, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। আজ তার পরনে ধুতি, গায়ে একটা নীল রঙের শার্ট।

ড্রাইভার না শোনে এমনভাবে চাপা গলায় বললাম, কী ব্যাপার বলুন তো! হঠাৎ আমাকে নেমন্তন্ন করার এত ঘটা কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুলু বলে, নিজের চোখে একটু যাচাই করতে চান।

অবাক হয়ে বলি, কী যাচাই করবেন?

আপনি দেখতে কেমন?

যাঃ! আমি দেখতে কেমন তা নিয়ে ওঁর মাথাব্যথা কেন?

তা তো জানি না। আগের দিন আমাকে পাঠিয়েছিলেন আপনাকে দেখে গিয়ে বর্ণনা দিতে।

সত্যি? কিন্তু কেন?

ঠাকুরমশাইয়ের মেয়ের মধ্যে এমন কী আছে যে, বিলেত ফেরত পাত্র এসে বিয়ের জন্য হামলে পড়ল তাই নিয়ে খুব ভাবছেন।

আপনি বললেন না কেন যে, আমি কালো কুচ্ছিৎ বিচ্ছিরি?

টুলু অম্লানবদলে বলল, বলেছি।

অবাক হয়ে বলি, কী বলেছেন?

বলেছি আপনি দেখতে খুব কুচ্ছিৎ। কালো তো বটেই, চোখ দুটো চিনেম্যানদের মতো, নাক চ্যাপটা, দাঁত উঁচু, আরও কী কী যেন, ঠিক মনে নেই।

আমি ভীষণ চমকে উঠে বললাম, সর্বনাশ! আমি সত্যি ওরকম নাকি?

টুলু নির্বিকার মুখে বলে, বউদিমণি যেমনটি চেয়েছিলেন তেমটিই বলেছি। আমার কী দোষ বলুন।

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, বউরানির কি ধারণা আমি খুব কুচ্ছিৎ?

টুলু সামনের রাস্তার দিকে সটান চেয়ে থেকে বলল, সেরকমই তো বলেছিলেন। ভুল শোনার কথাও নয়, বলেদিলেন, ঠাকুরমশাইয়ের মেয়ে কি আর ফর্সা হতে পারে? কালোই হবে নিশ্চয়। তাপর চুলের কথাও কী যেন বলছিলেন, এই ভেজাল তেলের বাজারে চুলও নিশ্চয়ই পাতলা হয়ে ব্যাঙাচির লেজ। এরকমই সব। তাতেও হল না, আমাকে দেখতে পাঠালেন। আমিও ফিরে গিয়ে বউদিমণি যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটিই বললাম। একটু বাড়িয়েই বলেছি বোধহয়। তাতে কোথায় খুশি হবেন, না হেসেই খুন। বললেন, যাঃ, নিশ্চয়ই অত কুচ্ছিৎ নয়, আমাদের রান্নার ঠাকুর দেখে এসে বলেছে বেশ ঢলঢলে চেহারা।

ভারী রাগ হল লোকটার ওপর। বললাম, বউরানিকে খুশি করতে আপনি ওসব বানিয়ে বলতে পারলেন? কেমন লোক আপনি?

টুলু তেমনি নির্বিকারভাবে বলে, খুশি আর হলেন কোথায়? হলে কি আর নিজের চোখে যাচাই করার জন্য আইবুড়োভাতের অছিলায় নেমন্তন্ন করে পাঠাতেন?

আমার কানমুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। বললাম, আমি সুন্দর হই, কুচ্ছিৎ হই তাতে ওর কী?

টুলু তেমনই উদাস গলায় বলে, গরিব পুরুতের মেয়ে, ওদেরই পূজারী বামুন, তার মেয়ের বিলেতফেরত পাত্র জুটছে জানার পর থেকেই উনি বড় অশান্তিতে আছেন।

বিলেতফেরত তো নয়, তার কানাডায় যাওয়ার কথা।

বউদিমণি অত ভূগোল জানেন না। তাঁর কাছে ও সবই বিলেত।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আপনি গাড়ি থামাতে বলুন। আমি বউরানিকে চেহারা দেখাতে যেতে পারব না। আমি নেমে যাব।

গলাটা একটু চড়ে গিয়েছিল। টুলু আমার দিকে একঝলক তাকিয়ে ফের দূরের দিকে চোখ রেখে বলল, কাজটা ঠিক হবে না।

খুব ঠিক হবে। এই অপমানের নেমন্তন্নে আমি যাব না।

টুলু খুব ম্লান মুখে বলল, আপনার ইচ্ছে। কিন্তু একটা কথা শুনবেন? কোনও উপদেশ শুনতে চাই না।

টুলু শুকনো গলায় বলল, আপনি বউদিমণির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জায়গায় প্রায় পৌঁছে গেছেন। কদিন পর আপনি বিদেশে চলে যাবেন, বউমিণির তোয়াক্কা না করলেও আপনার চলবে। কিন্তু আমরা-আমি বা ঠাকুরমশাই বা আর যারা এখানে পড়ে থাকব তাদের তো সেই জোর নেই।

একটু চুপ করে থেকে টুলু আবার বলল, হয়তো বউদিমণি তত খারাপও নয়। তার জন্য আপনার হয়তো মায়াও হবে।

আমি কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর হঠাৎ ফুঁসে উঠে বললাম, তাহলে কেন বললেন আমার দাঁত উঁচু? কেন বললেন আমার মাথায় চুল নেই? কেন বললেন আমার চোখ চিনেম্যানদের মতো?

লোকটা ভারি উদাস গলায় বলে, বলেছি বলেই কি আপনি ওরকম?

তবে আমি কীরকম?

লোকটা একটু চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মতো বলল, আপনাদের কত দয়া, কত মায়ামমতা, কত ভাল আপনারা! এ সবই তো মানুষের চেহারা।

আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি খুব খারাপ লোক।

ওপরের তলার মস্ত বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন বউরানি। গোলগাল, ভীষণ ফর্সা চেহারা। মুখখানা প্রতিমার মতোই সুন্দর। পরনে আগাগোড়া কাজ-করা খাঁটি মুগার শাড়ি। আর সারা গায়ে গয়না আর গয়না। হাতে ছগাছা করে চুড়ির ওপর মোটা মোটা বালা, দুহাতের আঙুলে অন্তত পাঁচটা হিরের আংটি, নাকে হিরের নাকছাবি, কানে হিরের টপ। গলায় একটা জরোয়া নেকলেস, একটা মটরমালা আর মস্ত সীতাহার। যেরকমটা হওয়ার কথা।

আমাকে দেখেই চোখ বড় বড় করে বলে উঠেলেন, তুমিই মধুরিমা! ওমা! কী সুন্দর দেখতে তুমি! এসো এসো ভাই, এই আমার পাশটিতে বোসো। বাঃ, তোমার মাথায় তো অনেক চুল! দেখ না ভাই, আমার রোজ মুঠো মুঠো চুল উঠে যাচ্ছে। কত তেল বদলাচ্ছি, কিন্তু হচ্ছে না।

আমি অধোবদনে বললাম, আপনার মাথাতে এখনও অনেক চুল।

তাই বুঝি! বিয়ের সময় তো আমাকে দেখনি! আমার চুল বাঁধতে দাসীরা হিমসিম নিয়ে যেত। খোঁপাটার তখন কত ওজন ছিল। তা ভাই, তুমি বিলেত গিয়েকী করবে? আজকাল মেয়েরা সব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়, কম্পিউটার শেখে।

দেখি। এখনও ঠিক করিনি কিছু।

তুমি নাকি ফার্স্ট ডিভিশনে মাধ্যমিক পাস করেছ! ইস, কী ভাল মেয়ে তুমি! বিলেত গিয়ে তুমি তো গাড়িটাড়িও চালাবে। টুলুবাবু বলছিলেন, ওসব দেশে নাকি গাড়ি চালায়গরিবেরা, বড়লোকেরা প্লেন চালিয়ে যাতায়াত করে। সত্যি নাকি?

আমি অত জানি না।

তুমি কিন্তু সত্যিই ভারি ভাল দেখতে। এ মা! তুমি আজ সাজোনি কেন বলো তো! সাজতে ভাল লাগে না? না। সেজে কী হবে?

না না, ওটা কথা নয়। মেয়েদের একটু সাজা ভাল। আমার তো ভাই সাজতে বড্ড ভাল লাগে। কোথাও যাওয়ার না থাকলেও সেজেগুজে ঘরেই বসে থাকি। একটু হাসলাম।

আমি কিন্তু ভাই আজকালকার স্টাইল কিছু জানি না। জানব কি করে বলো! বাড়ি থেকে বেরুলে তো! আগে তবু সিনেমা থিয়েটারে যেতাম। এখন তো থিয়েটার হলগুলো বন্ধই হয়ে গেছে। আর টি-ভিতে এত সিনেমা দেখায় যে হলে যেতে আর ইচ্ছেই হয় না। যাওয়া বলতে শুধু বাপের বাড়ি আর বিয়ে বাড়িটাড়ি। একদম কুয়োর ব্যাঙ।

আপনার বন্ধু নেই?

বন্ধু! সে একদম ছেলেবেলায় দু'চারজন ছিল। মা কারও সঙ্গে মিশতে দিত না তো! তারপর অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গেল। আর কেউ বন্ধু হল না। এখন দাসীটাসীদের সঙ্গে বসেই যা গল্পগাছা করি। সেসব এলেবেলে কথা।

গলায় একটু চাপা ক্ষোভ আছে কি? আপনার একা লাগে না?

একা! তা বোধহয় লাগে একটু। তখন টি ভি দেখি।

বই পড়েন না?

না বাবা, বই পড়লে মাথ ধরে।

গান শোনেন?

একটু আধটু শুনি। চারদিকে সারা বছর এত মাইক বাজে যে, আলাদা করে আর শুনতে হয় না।

এবার আমি মুখ তুলে বউরানির দিকে তাকালাম। ওঁকে আমার এখন খুব খারাপ লাগছে না।

দ্বিচারিণী

বউরানি একটু আনমনে দেয়ালের গায়ে একটা হোঁতকা টিকটিকির দিকে চেয়ে থেকে বললেন, মাঝে মাঝে গাড়ি করে গঙ্গার হাওয়া খেতে যাই অবশ্য। বেশ লাগে। জাহাজ ভোঁ দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে----মনটা কেমন করে যেন তখন।

কথাটা শুনে আমার যে কেন কষ্ট হল কে জানে!

বউরানি একটু গাঢ় স্বরে বললেন, বাইরেও বেড়াতে যাই মাঝে মাঝে। কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, রাজস্থান, দক্ষিণ ভারত। কিন্তু ফিরে এসে কী মনে হয় জানো?

কী মনে হয়?

মনে হয় কেন গেলুম! গিয়েছিলুম তো ফিরে আসব বলেই? আমার যে ঘাট বাঁধা আছে। ও ভাই, আমি যে তখন থেকে একাই বকবক করে মরছি, তুমি কিছু বলছ না তো!

কী বলব?

বাঃ, তোমার কথা নেই? খুব মুখচোরা নাকি তুমি?

না। শুনছি তো!

মুখচোরা হলে তোমার চলবে কেন? আর কদিন পরেই তো তুমি সাহেবদের দেশে চলে যাবে। শিউমিউ করে ইংরিজিতে কথা কইবে।

হেসে বললাম, আপনি বলুন না। শুনতে বেশ লাগছে।

আহা, আমি কি কথা জানি? কোথায় শিখব বলো! কথা বলতে কেউ শেখায়নি যে। চুপ করে থাকতে শিখিয়েছে।

আবার বউরানির মুখের দিকে আমাকে তাকাতে হল। এত গয়না, এত রূপ, এত আত্মসন্তোষের ভিতরেও কোনও অন্য সংকেত লুকিয়ে রয়েছে কি? বউরানির মুখে কিন্তু সেরকমই একটা খুশির হাসি। আহ্লাদ ফেটে পড়ছে।

বুঝলে ভাই, যারা কথা জানে তারা কম কথা বলে। আর যারা কথা জানে না তারাই বকবক করে।

একটু হাসলাম মাত্র।

আচ্ছা, তোমার বিলেতফেরত বরটি কেমন বলবে?

লজ্জা পেয়ে মাথা নত করে বলি, খারাপ নয়। অনেক লেখাপড়া জানে, না?

তা জানে।

আমার বরের বিদ্যে জান তো! সেভেন অবধি।

তাতে কি?

না, কিছু নয়। কেউ ভাবতে পারে, এ যুগে সেভেন অবধি পড়া বরকে হয়তো আমার পছন্দ নয়। তাই না? কিন্তু আমি তো ভাই, বেশ সুখেই আছি, উনি তো ভালই রেখেছেন আমায়, কী বলো।

ঠিকই তো।

আর সব কি মনের মতো হয় বলো!

আমার মুখের দিকে চেয়ে বউরানি হঠাৎ হেসে ফেললেন, বললেন, হ্যাঁ ভাই, তোমার খিদে পায়নি তো! একটু সরবত খেয়ে নেবে?

না, না, বেশ তো বসে আছি।

লজ্জা পেও না। খিদে পেলে বোলো। ভাজাভুজিগুলো চাপাতে বলে দেব।

আচ্ছা।

তুমি আসবে বলে আজ আমি একটু সেজে বসেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে এসব তুমি ততটা পছন্দ করো না। তাই না?

না না, তা কেন? আপনাকে তো বেশ দেখাচ্ছে।

মস্ত দেয়ালঘড়িটার দিকে চেয়ে থেকে বউরানি বললেন, গয়না শাড়ি এসব ছাড়া আমার আর দেখানোর কী আছে বলো! গয়নাটয়না দিয়েই নিজেকে ভুলিয়ে রাখি। এসবই আমার খেলনা। কত লোক এ-বাড়িতে শুধু গয়না দেখতেই আসে। জানো?

না তো!

অনেক বড় বড় বাড়ির মেয়ে-বউরাও আসে। আমিও মনের আনন্দে দেখাই, তারপর বাক্সবন্দি করে একা ঘরে চুপটি করে বসে ভাবি। কী ভাবি জানো?

কী ভাবেন?

ভাবি, নন্দরানি, কেউ যদি একদিন তোর এইসব খেলনাপাতি কেড়ে নেয় তাহলে কী নিয়ে থাকবি? তোর তো বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, তেজ নেই, তখন বড্ড চোখে জল আসে।

চুপ করে থাকি।

বউরানি ফিক করে একটু হেসে বললেন, গয়না পরেছি বলে আমাকে ঘেন্না করোনি তো! তোমার গলায় শুধু একটা রাঙা পাথরের মালা দেখে আমার একটু ভয় হয়েছিল।

না না, সে কী?

তোমাকে দেখে আমার এত ভাল লাগছে কেন জানো? এই যে তুমি-তোমার বাবার টাকা নেই, গয়নাগাটি নেই, বনেদি বাড়ি নেই, তাও তুমি যেন ভরে আছ। কী ভাল লাগছে তোমাকে।

কী যে বলেন! আমার লজ্জা করছে।

বিলেতে গিয়ে আমার কথা মাঝে মাঝে ভাববে তো? একটু ভেবো। যখন ভাববে তখন বোধহয় তোমার সঙ্গে আমিও থাকব। আমিও তোমার কথা খুব ভাবব, দেখো।

জোর করে হাসলাম। হাসি আসছিল না।

ইস্, ছিঃ ছিঃ, দেড়টা বাজে। না, ওঠো তো, উঠে পড়ো, একটু হাতমুখ ধুয়ে নাও। তোমার খিদে পেয়েছে।

শ্বেতপাথরের মেঝের ওপর কী চমৎকার কার্পেটের আসন পাতা। অন্নব্যঞ্জন এল রুপোর থালা আর বাটিতে। রুপোর গেলাসে জল।

ও বাবাঃ! আমি কি এত খেতে পারি?

তাও কি হয়! আইবুড়োভাত বলে কথা। বেড়ে তো দিতেই হবে। যা পারো খাও, বাকি পড়ে থাকবে। নষ্ট হবে যে!

নষ্ট হবে কেন? কাক খাবে, কুকুর খাবে। ভূতভুজ্যিতে লেগে যাবে।

আমি একা খাব! আপনি? তোমাকে খাইয়ে তারপর। তুমি যে বামুনের মেয়ে।

আমার ভারি লজ্জা করছে।

বউরানি একটু হেসে বললেন, তোমার চেয়ে যে আমি অনেক গরিব ভাই। সত্যিই গরিব।

।।পাঁচ।।

কুসুমকমার

সেদিন রাত প্রায় দশটায় বউদিমনি ডেকে পাঠালেন আমায় দোতালায় তাঁর শোওয়ার ঘরে। পালঙ্কে বসে আছেন, মুখেচোখে একটা উৎকণ্ঠা আর অন্যমনস্কতা।

আমাকে ডেকেছেন?

বিহ্বল এক চোখে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ভ্রু কুঁচকে বললেন, ডেকেছিলুম তো! কিছু কাজ আছে?

বউদিমণি আমার মুখের দিকে তেমনই অসহায়ভাবে চেয়ে থেকে বললেন, কেন ডেকেছিলুম বলুন তো! কিছুতেই এখন মনে পড়ছে না।

আমি অস্বস্তি বোধ করে বললাম, দাঁড়াব কি?

দাঁড়াবেন! কেন, ওই কোচটায় বসুন না!

বসলাম, বউদিমণি খানিকক্ষণ দেয়ালের দিকে চেয়ে থেকে মাথা নেড়ে বললেন, হঠাৎ কী একটা মনে পড়ল বলে ডাকলাম। এখন আর মনে পড়ছে না।

তাহলে আমি ঘরে যাই? মনেপড়লে ডেকে পাঠাবেন। আমি জেগেই থাকব।

ফের ভ্রু কুঁচকে গেল, আপনার ঘরে কে থাকে বলুন তো? গোকুল।

গোকুল! আপনি আমার ছেলের মাস্টারমশাই, আপনি গোকুলের ঘরে থাকবেন কেন?

তটস্থ হয়ে বলি, তাতে কী? গোকুল লোক ভাল। আমার কোনও অসুবিধে হয় না।

গোকুল ভাল লোক? ভীষণ চোর। না, আপনি কাল থেকে সরকারবাবুর পাশের ঘরটায় থাকবেন। কয়েকটা ভাঙা আসবাব আছে, এগুলো সরিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে দিতে বলে দিচ্ছি। বিনীতভাবে বলি, তার দরকার ছিল না।

নিশ্চয়ই দরকার। মানুষের মানমর্যাদা আছে আছে না? যে আজ্ঞে।

আমার মানমর্যাদা কবে হল তা বুঝতে পারলাম না। তবে খুশিই হলাম। বাড়ির উত্তর দিকে বাগানের মধ্যে একটা পাকা ব্যারাকবাড়ি, তিনখানা ঘর। লাগোয়া কলঘর আছে। নগেন সরকার বাবুদের খাতাপত্রের জিম্মাদার। তার সঙ্গে আমার ভাবসাবও আছে। শনি রবিবার বর্ধমানে নিজের বাড়িতে যান।

বউদিমণি বললেন, এ বাড়ি থেকে আপনাকে ছেলে-পড়ানোর জন্য কিছু দেওয়া হয় না, না? থাকতে তো দিয়েছেন।

ওটা কথা নয়। কাল থেকে সরকারমশাইয়ের সঙ্গেই আপনিও খাবেন।

যে আজ্ঞে। কথাটা কি মনে পড়েছে?

না। কেন মনে পড়ছে না, বলুন তো! সাড়ে দশটা বাজে। আমি একটু ফাঁপরে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? বললাম, ঠিক আছে, আপনি ভাবুন।

আচ্ছা, আজ থাকগে। মনে পড়লে ডেকে পাঠাব।

পরদিন রোববারে দুপুরে ঘর বদল করার পর নতুন ঘরে বসে একটু হাঁফ ছাড়ছি, বউদির এত্তেলা এল।

ওপরের বৈঠকখানায় বউদিমণি বসে। মুখে চোরা হাসি।

বসুন।

বসলাম।

নতুন ঘর পছন্দ হয়েছে?

আজ্ঞে।

গালে অত খোঁচা খোঁচা দাড়ি কেন? কামাতে পারেন না?

লজ্জা পেয়ে বলি, তিন-চারদিন পরে কামাই।

তা কেন? রোজ কামাতে হয়। নইলে দাড়ি রাখুন।

কোনটা করব ঠিক করতে না পেরে বললাম, যে আজ্ঞে।

খুব ছেলেমানুষের মতো উনি একটু ঠ্যাং নাচালেন। পায়ের রুপোর মলে রুনুঝুনু বেজে গেল কিছুক্ষণ। আপনাকে একটা কথা বলব। বলুন। বলব। তাড়া কিসের? আচ্ছা।

আবার ঠ্যাং নাচানো। ফের রুনুঝুনু শব্দ। মুখে চোরা হাসি। কেন যে অস্বস্তি হচ্ছে বুঝতে পারি না। মেয়েদের আমি কমই চিনি। মায়ের বারণ ছিল, মেয়েদের মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে নেই, তাতে ওদের অপমান হয়। সেই অভ্যাস বজায় রাখা যায়নি, পথেঘাটে নিত্যদিন হাজারও মেয়ের ভিড়ে। তবে সেই সঙ্কোচটা এখনও আছে। মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারি না, চোখ আপনা থেকেই নেমে আসে।

রুনুঝুনু শব্দ থামল। বউদিমণি ঠ্যাং নাচানো বন্ধ করে ঘরের ঝাড়লণ্ঠনের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কত মাইনে পান বাইরে চাকরি করে? আটশো। মাত্র? হ্যাঁ।

তাহলে আমাদের পুরুতের চাকরিটা নিলেন না কেন?

মাথা নিচু করে বলি, ঠাকুরমশাই তো আছেন।

আপনার মন্ত্রপাঠ তো অনেক ভাল। ঠাকুরমশাইয়ের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। পুজোর নানা অঙ্গ আছে। অনভিজ্ঞদের ভুল হয়।

ওসব নয়। আসলে আপনি ঠাকুরমশাইয়ের কাজটা নিয়ে ওকে বঞ্চিত করতে চাননি। কিন্তু কেন বলুন তো?

না, তা নয়।

গলাটা এক পর্দা নামল, আপনি ওর মেয়েটার প্রেমে পড়েননি তো!

লজ্জায় কান রাঙা হয়ে গেল। বললাম, কী যে বলেন বউদিমণি! আমার যা অবস্থা তাতে ওসব মনেই আসে না।

প্রেমে পড়ে লাভও তো নেই। ওর বিয়ে ঠিকই হয়ে গেছে।

চুপ করে থাকি।

বউদিমণি খিলখিল করে হেসে বললেন, আর অত লজ্জা পেতে হবে না। মুখটা একটু তুলুন।

অ্যাঁ!

এদিকে তাকান।

ক্রীতদাসের মতো তাকাই। আবছা চোখে তেমন কিছু দেখতে পাই না।

এই যে! এই হারটা দেখেছেন?

বউদিমণির গলায় একটা মস্ত সোনার হার দেখতে পাই। এক নলা হার নয়, দুই বা তিন নলা। বেশ চওড়া।

এটা কী হার বলুন তো?

সোনার গয়না সম্পর্কে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই যে!

আপনি একদম বুদ্ধু। একে বলে সীতাহার।

সীতাহার? বাঃ বেশ হার।

কত ভরি সোনা আছেন জানেন?

আজ্ঞে না।

বাইশ ভরি।

আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, ও বাবা!

বউদিমণি হারটা গলা থেকে খুলে বললেন, কিন্তু ওজন সম্পর্কে আমার একটু সন্দেহ আছে। শচীন স্যাঁকরার ওজনে বাইশ ভরি। আমার মনে হয় ঠিকঠাক ওজন করলে আঠারো উনিশের বেশি হবে না। আপনি এটা একটা ভাল জায়গা থেকে ওজন করিয়ে আনতে পারবেন?

আমি?

নয় কেন?

মাথা চুলকে বললাম,সোনাদানার ব্যাপার কি আমি বুঝব?

বউদিমণির মুখে সেই মুখ-টেপা হাসি, কচি খোকা হয়ে থাকলে কি চলবে? এতদিন না হয় মায়ের আঁচলের তলায় ছিলেন, কিন্তু এখন তো পাকাপোক্ত হতে হবে।

যে আজ্ঞে।

হারটা আমার হাতে দেওয়ার সময় বউদমণি যে কেন আমার হাত দুটো একটু চেপে ধরলেন তা স্পষ্ট বুঝলাম না বটে, কিন্তু পাপী মন কুচিন্তা করতে লাগল। এরকমও হয় নাকি?

কিন্তু কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গেই করলাম। বউবাজারে এক সোনার দোকানে গিয়ে হারটা ওজন করাতে চাইতেই দোকানি আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, চোরাই মাল নাকি?

গম্ভীর হয়ে বললাম, না।

ইলেকট্রনিক ওজনযন্ত্রে দাঁড়াল আটাশ ভরি।

দোকানি বলল, সাবেকি জিনিস। বেচবেন?

হারের মালিক যদি বেচতে চান তাঁকে আপনার কাছেই নিয়ে আসব।

আসবেন আমরা সোনায় ঠকাই না।

ফিরে এসে যখন বউদিমণিকে হার ফেরত দিয়ে ওজনটা বললাম তখন উনি একটুও অবাক হলেন না। একটু হাসলেন মাত্র। দেয়ালে গাঁথা সিন্দুকটা খুলে আমার সামনেই একটা স্টিলের বাক্স নামালেন, খুললেন এবং তার ভিতরে অবহেলায়

সীতাহারটা নিক্ষেপ করে রহস্যময় চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, হারটা একজনের জন্য রেখে দিলাম।

আমি বিনা কৌতুহলে বললাম, ও।

কার জন্য বলুন তো!

মাথা নেড়ে বললাম, জানি না।

আপনার বউয়ের জন্য।

একটু হাসলাম। একটা কথা জানা ছিল, কাকেরও কোড়ভ হবে, ধুলায় লুটায়ে যাবে। কথাটা বউদিমণিকে বলা যায় না।

শনিবারের কথা। মধুবাবু এক মোকদ্দমার তদবির করতে পাটনা গেছেন। সরকারবাবু গেছেন দেশে। রাত বারোটা নাগাদ আমার ঘরের দরজায় মৃদু টোকার শব্দ হল। ফাঁসির আসামি যেমন কখন ডাক আসবে তার জন্য সবসময়ে প্রহর গোনে, ঘুম থেকে জেগে উঠেই আমরাও মনে হল, এই ডাক যে আসবে সেই ভয়ই আমার মনের গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আমি জানতাম, এরকমই হবে।

দরজা খুলে দেখি, বউরানির বাপের বাড়ি থেকে আনা খাস দাসী বুড়ি সত্যবালা দাঁড়িয়ে। চাপা গলায় বলল, পিছনের লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাও। বউরানি তোমার জন্য বসে আছেন।

জানি, দাসীর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। সত্যবালা অনেকটা বিশ্বাসী কুকুরের মতো। যা হুকুম হবে তাই করবে, প্রশ্ন তুলবে না। তুলে লাভও নেই।

আমি বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে আছি দেখে সত্যবালা গুনগুন করে বলল, ভাবছ কেন? তুমি পুরুষমানুষ, তায় হাড়হাভাতে, তোমার তো কপাল খুলে গেল। জ্বলেপুড়ে মরার যা মরবে তো ওই মুখপুড়ি, যা-ও। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না বাপু, বরাতজোরে নজরে পড়েছে।

সত্যদিদি, বউদিমণি কী চান?

মধুর মতো পুরুষের ঘর যাকে করতে হয় জ্বালা সেই জানে। আর যা-ই হোক, এ বাড়িতে পড়ে থেকে পচে মরতে চায় না। যাও না, মুখোমুখি কথা বলে দেখ।

ফাঁসির আসামির মতোই আমি পা বাড়ালাম। পায়ে পায়ে জড়িয়ে, দুরুদুরু বুকে, কাঁপা কাঁপা শরীরে। লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একখানা ঘর পেরিয়ে বউদিমণির ঘর। মৃদু আলো জ্বলছে। বউদিমণি তার বিশাল পালঙ্কে বসা। এসো।

আজ মুখে হাসি নেই, খুব একটা সাজগোজও নেই। বড় দুখানা স্যুটকেস দেয়ালের ধারে দাঁড় করানো। আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কেমন পুরুষমানুষ? সীতা-উদ্ধার করতে পার?

আজ্ঞে, কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

খুব পারছ। তুমি অত বোকা নও।

মাথা নিচু করে বললাম, খানিকটা পারছি। পুরোটা নয়।

আমি তোমাকে নিয়ে পরশু ঝাড়গ্রাম যেতে চাই।

আমি একটু হাসলাম, আমাকে নিয়ে?

একটু গাঢ় স্বরে বউদিমণি বললেন, তুমি খুব ভাল একজন মানুষ। তোমার লোভ নেই, তুমি বিশ্বাসঘাতক নও, তোমার দয়ামায়া আছে। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, এই মরা মেয়েমানুষটার মধ্যে যেটুকু ধুকধুকুনি এখনও আছে সেটুকুকে এ বাঁচাতে পারে।

আপনি যে সীতা-উদ্ধারের কথা বলছিলেন বউদিমণি, সীতাকে তো উদ্ধার করেছিলেন তাঁর স্বামী রাম।

জানি। এটা কলিকাল তো। সীতা এখন রামের খপ্পর থেকেই উদ্ধার পেতে চাইছে। অনেকদিন পুতুল সেজে রইলাম। এবার একটু মেয়েমানুষ হতে চাই। বুঝলে?

চুপ করে আছি। কথা আসছে না। বউদিমণি খুব নরম গলায় বললেন, ভয় পেয়েছ?

একটু ভয় তো হচ্ছেই।

তোমার খুব ভয় করছে, আমি জানি।

মাথা নিচু করে বললাম, হ্যাঁ।

ভয় তো আমার হওয়ার কথা। এত বড় বাড়িঘর রইল, সংসার নিয়ে পুতুলখেলা পড়ে রইল, স্বামী-পুত্তুর রইল। কই আমার তো ভয় করছে না। তোমার তিন কুলে কেউ নেই, পিছটান নেই, তোমার ভয় কিসের পুরুষমানুষ? পুলিশের ভয় পাচ্ছ না তো!

আমার অনেক রকম ভয়।

আমি চলে গেলে তুমি কি ভাব মধুবাবু থানা-পুলিশ করবে? করত, যদি ছেলেকে নিয়ে যেতুম। শুধু আমার জন্য সে একটুও হইচই করবে না। বদনামের ভয়ে চুপটি করে থাকবে। ধামাচাপা দেবে।

হঠাৎ বউদিমণির বড় বড় চোখ জলে টসটসে হয়ে এল। আঁচলটা তুলে মুখ চাপা দিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বললেন, আমার বয়স কত জানো? মাত্র সাতাশ কী আঠাস। এই বয়সের একটা মেয়ের কত কী করার থাকে! আমি শুধু সময় আর সময় কাটিয়ে যাই। আর কত সময় কাটাব বলো! সময় তো সমুদ্দুর।

অথৈ। আমার বুড়ো হতে যে অনেক দেরি! ততদিন আর কত সময় কাটাব বলতে পারো?

ছেলের জন্য আপনার মন কেমন করবে না?

করবে না? খুব করবে। কিন্তু ওর বাবা আছে, টাকা আছে, দাসদাসী আছে। মায়ের অভাব ও টেরই পাবে না। তারপর ঝা করে বড় হয়ে যাবে, নিজের মতো হয়ে যাবে। ওর জন্য ভাবব কেন? তুমি কি আমাকে দুর্বল করে দিতে চাইছ?

না তো! শুধু ভাবছি, আমার মা আমাকে কত আগলে থাকত।

পরিবেরই মা-বাবা থাকে, যাদের টাকা আছে টাকাই তাদের মা আর বাবা। আমার ছেলে ঠিক তার মতো করেই বড় হয়ে যাবে।

আমার মুখে কথা আসছে না। ফাঁসির দড়ি ধীরে ধীরে গলায় এঁটে বসছে। আমার কিছু করার নেই।

বউদিমণির চোখ দুটো ফের জলে ভরে এল তারপর গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল বেয়ে। আকুল গলায় বললেন, পারবে না? আমার জন্য এটুকু পারবে না?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কিছু বলতে পারছি না। কথা আসছে না। বউদিমণি নিজেই সামলে গেলেন। ধীরে ধীরে বললেন, ঝাড়গ্রামের বাড়িটা আমাকে আমার দাদামশাই দিয়ে গেছেন। তোমাদের মধুবাবু জানেও না সে বাড়ির কথা। একদিন অসহ্য হলে পালিয়ে যাব বলে ওকে বাড়িটার কথা কখনও বলিনি। শুধু সত্যবালা মাঝে মাঝে গিয়ে সব গুছিয়ে রেখে আসে। চারদিকে শালবন, পাখির ডাক। কাছে একটা নদী আছে। রাঙা মাটির কাঁকুরে পথ ধরে যদি চলে যাও গহীন জঙ্গলে পৌঁছে যাবে। ফাঁকে ফাঁকে ধ্বংসস্তূপ, লোধাদের বস্তি, আদিবাসী গির্জা। একদিন-যদি তুমি আর আমাকে না চাও তাহলে আমি হয়ত খ্রিস্টান মিশনারি হয়ে যাব। আমার যে কত কী হতে ইচ্ছে করে। ভালমানুষ, একজন বিপন্ন মহিলাকে মনের মধ্যে তুলে নিতে পারে না? তুমি কেমন ভালমানুষ?

ওঁর গলায় যে কান্নার মতো ধ্বনি উঠে এল সেটা কেমন বিবশ করে দিল আমাকে। আমি বললাম, আচ্ছা যেমন চাইছেন তাই হবে।

ও কেমন কাঠ-কাঠ কথা।

[illegible] খাটের বাঁ ধারে মস্ত কারুকাজ করা দু পাল্লার [illegible] একটা ফাঁক। ওপাশে অন্ধকার। সেই ফাঁকটার দিকে চেয়ে আমি [illegible] গলায় বললাম, কীভাবে বলতে হয়?

বউদিমণি উঠে আচমকা একটা টেউয়ের মতো এসে পড়লেন। দামি জর্দা, বিদেশি সেন্ট আর মেয়েমানুষের অচেনা গন্ধ আমাকে জাপটে ধরল। প্রগাঢ় এক

থরো থরো চুম্বনের পর বউদিমণি রুদ্ধশ্বাস গলায় বললেন, এইভাবে বলতে হয় পুরুষমানুষ, এইভাবে।

আমি দরজার ফাঁকটার দিকে চেয়ে হাতের পিঠে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে বললাম, ওই দরজাটা-ওখানে কেউ আছে।

বউদি চকিতে ঘাড় ঘোরালেন, কে?

জানি না!

বউদির ফর্সা মুখ হঠাৎ লাল হয়ে গেল, কে খুলে রেখেছে দরজাটা?

ধীরেসুস্থে গিয়ে দরজাটা খুললাম। ফাঁকা দরদালান। অন্ধকার।

বউদিমণির মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। বড্ড ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে এখন। মৃদু স্বরে বললেন, কে ছিল বলো তো?

জানি না।

দরজাটা আমি নিজের হাতে বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়েছিলাম।

চোখে ঘোর সংশয় নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন বউদিমণি। তিনি ভয় পেয়েছেন।

আমি নিঃশব্দে তাঁর দিকে চেয়ে আছি। ভীষণ হতাশভাবে বিছানায় বসে বউদিমণি বললেন, এ বাড়িতে অনেক চোখ, অনেক কান। তুমি যাও টুলু। আমার বড় অস্থির লাগছে। সত্যবালাকে একটু ডেকে দিয়ে যেও, সে গোলবারান্দায় বসে আছে।

জর্দার গন্ধটা অনেকক্ষণ গেল না ঠোঁট থেকে। বউদিমণির জর্দা আসে চিৎপুর থেকে। আমার গেঞ্জিতে সেন্টের গন্ধটাও লেগে রইল। সবকিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল মেয়েমানুষের শরীরের রহস্যময় গন্ধ। কিংবা সেটা হয়ত আমার বিভ্রম। মেয়েমানুষের কি আর আলাদা গন্ধ থাকে। কিন্তু আমি গন্ধ টের পাচ্ছি। আমার ভিতরকার উপোসি ঘুমন্ত এক বাঘ জেগে উঠে লেজ আছড়াচ্ছে, হুংকার ছাড়ছে। সে কি এবার শিকারে বেরবে?

কালো একটা লাইন আমার চোখের সামনে স্থির হয়ে রইল। মস্ত সেগুনের দরজায় চুলচেরা একটুখানি ফাঁক। অন্ধকার থেকে একটিমাত্র বিষচক্ষু দেখে নিচ্ছে আমাকে। বউদিমণিকে।

এই আমার প্রথম পাপ। আমি নদিয়ার শান্তিপুরের কুসুমকুমার গরিবের ছেলে। দুনিয়ার কোটি কোটি অজান মানুষের একজন। আমার সূর্য ওঠে তিলজলায়, শিবপুরে অস্ত যায়। একটুখানি আমার জগৎ। হঠাৎ সেই জগতে এ কীরকম ভাঙচুর!

ঘুম এল না। কতবার যে কলঘরে গেলাম। কতবার নিজেকে অপরাধী ভেবে মনস্তাপ হল। চোখে জল এল।

দ্বিচারিণী

।।ছয়।।

মধুরিমা

এ কী করছেন আপনি? এ মা! এটা কেন পরাচ্ছেন আমাকে?

একটু পর ভাই। দেখি তোমাকে কেমন দেখায়। বাঃ, কী ভাল মানিয়েছে তোমাকে!

কেন আপনার জিনিস আমাকে পরাচ্ছেন?

আমার জিনিস আবার কী? যখন যার, তখন তার। দেখ না, আয়নার দিকে চেয়ে নিজেকে একবার ভাল করে দেখ। ঠিক যেন তোমার জন্যই তৈরি হয়েছিল হারখানা।

বড্ড রেগে যাই মনে মনে। এসব কী হচ্ছে বুঝতে পারি না। বললাম, না না, এবার এটা খুলে নিন।

পাগল! এটা যে আজ তোমার আইবুড়োভাতের দক্ষিণা।

সে কী! আমার আবার দক্ষিণা কিসের? না বউরানি, এরকম করবেন না, আমি এসব নিতে পারব না। আমি গয়না পরি না।

এটা গয়না তো নয়, এটা আমার ভালবাসা। ভালবাসা ফিরিয়ে দিতে হয় বুঝি?

আমি হেসে ফেললাম, ভালবাসার সঙ্গে গয়নার কী সম্পর্ক বউরানি? ভালবাসা তৈরি হয় মনে, আর গয়না স্যাঁকরার দোকানে।

ওমা! তুমি তো বেশ কথা বল! তাহলে সারাদিন চুপটি করে ছিলে কেন!

আপনি এটা বাক্সে তুলে রাখুন বউরাণি। আমি এটা নিতে পারব না।

ফিরিয়ে নিয়ে কি পরের জন্মে কালীঘাটের কুকুর হব! ওটা তোমাকে দেব বলে যে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।

বিশাল সীতাহারের ভারে আমার যে কী অস্বস্তি হচ্ছে তা বলার নয়। এরকম অপ্রস্তুতও করে কেউ! ছোটখাটো একটা আংটি বা দুল হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু এর যে কিলোখানেক ওজন!

বউরাণি মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, এটা পরে কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে। মনে থাকে যেন।

আমার চোখে জল এল। বললাম, কেন গয়না দিচ্ছেন বউরাণি? আমার যে একটা বিদ্রোহ আর প্রতিবাদ ছিল।আমি ঠিক করে রেখেছিলাম আমার গরিব বাপের মর্যাদা রাখতে আমি লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরে এরকমই পাথরের মালা গলায় দিয়ে বিয়ে করতে বসব। কিছুতেই সাজব না।

বউরাণি হেসে ফেললেন, তবে তাই করো। তোমাকে হয়ত তাতেই মানিয়ে যাবে। এই সীতাহারখানা বাক্সে রেখে দিও। আমার তো প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেখেছি, প্রতিবাদের বদলে অপরাধ আর পাপ করে ফেলছি। কি জানি ভাই, তোমার মতো মাথা তো আমার নেই।

পড়ন্ত বেলায় যখন বউরানির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি তখন ওঁর দুই বড় বড় চোখে টসটসে করছে জল। এত ভাল কেন যে লাগল মানুষটাকে!

গাড়িতে পাশে বসে তেমনই সোজা ঘাড়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে লোকটা। সাড়াশব্দ নেই।

শুনছেন?

কিছু বলবেন?

এবার আপনার চাকরি যাবে।

কেঠো হাসি হেসে বলল, তাই বুঝি! কেন, কী করেছি?

কী করেছেন তা আবার জিজ্ঞেস করছেন। আমাকে দাঁত উঁচু, কেলে কুষ্টি কত কী বলে বউরানির কাছে লাগিয়েছিলেন তো! কিন্তু বউরানি আমাকে যে সুন্দর বলেছেন।

আপনি তো সুন্দরই।

আর এটা দেখেছেন আমার গলায়?

দেখেছি, সীতাহার।

কিছুতেই নেব না, তবু এত ভালবেসে আদর করে দিলেন যে ফেরাতে পারলাম না। এত লজ্জা করছে! কী ভারী বলুন তো!

হ্যাঁ, ওটার ওজন পনেরো! তাহলে তো এর অনেক দাম!

হ্যাঁ। অনেক।

ইস্ আমার যে এখন ভীষণ খারাপ লাগছে। এটা দেওয়ার কী দরকার ছিল বলুন তো!

আপনাকে বেশ মানিয়েছে।

ছাই মানিয়েছে। আমার মতো রোগা মানুষকে এত বড় হার কখনও মানায়! এসব গিন্নিবান্নিদের গয়না। সেকেলে।

তাহলে তাই হবে। কিন্তু আপনার গলায় খারাপ লাগছে না।

বউরানিকে আপনার কেমন লাগে?

ভালই তো।

আমার কিন্তু খুব ভাল লাগল। যা ভেবেছিলাম তা নয়। আপনিও যেন এরকম একটা কী বলছিলেন তখন। হ্যাঁ।

আপনি খুব খারাপ লোক। আমি কিছুতেই ভুলবো না যে আপনি বউরানিকে খুশি করতে আমার চেহারার নিন্দে করেছিলেন।

মানুষকে খুশি করেই যে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়।

কথাটা এমনভাবে বলল, একটু কষ্ট হল আমার।

দ্বিচারিণী

সামনেই একটা রোড ব্লক। রাস্তা বন্ধ করে সারাইয়ের কাজ হচ্ছে। ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বলল, ঘুরে যাওয়ার কোনও রাস্তা আছে? এ পথ দিয়ে তো যাওয়া যাবে না।

আমি বললাম, আছে। তবে সে রাস্তা ভীষণ ভাঙা। আপনাকে আর যেতে হবে না। এখান থেকে পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়ি একটুখানি রাস্তা। আমি চলে যেতে পারব।

ড্রাইভার শঙ্কিত গলায় বলে, বউরাণি শুনলে রাগ করবেন।

আমি হেসে বললাম, বউরানি জানবে না। আপনি গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।

ড্রাইভার তবু দোনোমোনো করছিল, আমি নেমে পড়লাম। সঙ্গে টুলুও।

এ কী? আপনি নামছেন যে!

আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরে যেতে পারি না।

ওমা! কেন? এ তো আমার পাড়া। তা হোক।

নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গাড়ি করে যাওয়া, রুপোর থালায় ভাত খাওয়া থেকে শুরু করে এতক্ষণ যে দমবন্ধ লাগছিল তা থেকে মুক্তি। ড্রাইভারকে বললাম বটে, একটুখানি পথ। আসলে এখান থেকে আমাদের বাড়ি অন্তত পনেরো মিনিটের রাস্তা।

আপনি যে কোন নামলেন। আমি একাই যেতে পারতাম।

পাগল! আপনার গলায় সীতাহার। একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হত না।

ও তাই তো! ভুলেই যাই। আপনি আজ এত গম্ভীর কেন?

টুলু কী একটু ভাবল। তারপর বলল, ও কিছু নয়।

সামনেই অনেক দিনের পুরনো একটা বন্ধ কারখানার দেওয়াল, উল্টোদিকে মজা পুকুর। খুব নির্জন। একটু অন্ধকার। পিছন পিছন দুটো ছেলে আসছিল। লক্ষ করিনি, টের পাচ্ছিলাম। একটু দূরেই ছিল ওরা। হঠাৎ জোর কদমে ছেলে দুটো দৌড়ে আসছিল। পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাতেই ওরা আমার ওপর এসে পড়ল। কপালের ডান পাশে কী দিয়ে যে মারল কে জানে, আমার মাথায় বিদ্যুতের মতো একটা যন্ত্রণা ঝলসে উঠল।

মা গো! বলে বসে পড়ছিলাম। আর তখনই টের পেলাম গলা থেকে সীতাহারটা কে যেন টেনে নিয়ে গেল। আটকানোর সাধ্যই ছিল না আমার। চোখে অন্ধকার দেখছি।

তার মধ্যেই টুলুর একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। আর দৌড়ের আওয়াজ।

কী হল বুঝতে আমার সময় লাগল। মাথার অন্ধকার কাটিয়ে যখন চোখ চাইলাম তখন কাছে কেউ নেই। কিন্তু কারখানার দেওয়ালটা যেখানে শেষ হয়েছে

সেখানে আবছা দু-তিন জনকে আলো-আঁধারিতে দেখতে পেলাম আমি। একজনকে দুজন মিলে একটা কিছু করছে। হয়তো ভয়ঙ্কর কিছু। একটা অচেনা গলা চাপা হিংস্রতায় বলে উঠল, মেরে ফেলব শালা খানকীর বাচ্চা। জানে মেরে দেব।

আমি হঠাৎ উঠে পড়লাম। ওরা টুলুকে মারছে। চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়োতে লাগলাম, মেরোনা! মেরোনা! হার নিয়ে যাও ওকে মেরো না।

দৌড়াতে কি পারি? পা টলছে। মাথা ঘুরছে।

কারাটে শেখার যে কোনও মানেই নেই তা আমি জানতাম। বিপদে পড়লে মেয়েরা চেঁচানী কেউ শুনতে পেল না। ছুটতে গিয়ে দুবার পড়েও গেলাম।

প্রথম একটা ছেলে পড়ল, তারপর আরও একটা। তিন নম্বর ছেলেটা একজনকে টেনে তুলল।

দিবি না শালা শুয়োরের বাচ্চা! তোর মাকে....

কানে আঙুল দিলাম। দৌড়চ্ছি, কিন্তু পৌঁছতে পারছি না কেন? এতদূর তো নয়!

হটাৎ দুটো ছেলে দৌড়ে কারখানার পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল।

যখন পৌঁছলাম তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে টুলু। পেট আর বুকে দুটো হাত চেপে উঠে বসার অক্ষম চেষ্টা করল। আমাকে দেখে ওই সাঙ্ঘাতিক অবস্থার মধ্যেও একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, নিতে পারেনি। এই যে-

হাতে সেই সাপের মতো বড় সীতাহারখানা। আমি এক টানে হারটা ধুলোয় ফেলে দিয়ে বললাম, বলতেই লাগলাম, কেন? কেন? কেন? কেন?

চোখের জলে ভেসে যাচ্ছি, কেঁপে যাচ্ছি সেতারের মতো। দু'হাত ভরে যাচ্ছে রক্তে।

ও বলল, হারখানা ফেলে দেবেন না। ব্যাগে ভরে রাখুন। ওটার যে অনেক দাম।

কত দাম? কত? আপনার প্রাণের চেয়ে বেশি?

কয়েকটা ছেলে ফুটবল খেলে ফিরছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, শোনো ভাই, শিগগির এস। একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

তারা ভাল ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে চলে এল।

ইস। কী করে হল?

পলিটিক্যাল কেস নাকি দিদি?

না ভাই, দুটো গুন্ডা ছেলে ছুরি মেরে গেছে।

ওরা দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে এল। ধরাধরি করে তুলল। আমি যখন উঠতে যাচ্ছি একটা ছেলে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, এটা পড়েছিল ওখানে। আপনার?

সেই সীতাহার। একবার ভাবলাম বলি, না, আমার নয়। তারপর অনিচ্ছুক হাত বাড়িয়ে হারটা নিয়ে ব্যাগে ভরলাম। এ হারের বাজারদর জানি না, কিন্তু একজন বড্ড ভাল লোক যে এর জন্য মরতে বসেছে তা ভুলি কী করে!

পরের ঘটনাটুকু ঘোরের মধ্যে ঘটছিল। ভাল করে চেতনা ছিল না আমার। হাসপাতালে বোধহয় প্রথমটায় নিতে চায়নি, ছেলেগুলো চেঁচামেচি, ঝগড়া করে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করল। ডাক্তার এল। অক্সিজেন এল। সেলাই করতে নিয়ে গেল ওটিতে। আমি বিবশ শরীরে বারান্দায় একটা সিঁড়িতে বসে রইলাম। পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে চোখের সামনে।

ছেলেগুলোই এসে তুলল আমাকে। বলল, বাড়ি যান দিদি, ডাক্তার বলেছে বাহাত্তর ঘন্টা। বাঁচবে?

দুটো স্ট্যাব ইনজুরি। কিছু বলা যায় না। আপনার হাজব্যান্ড?

না না। আমার বন্ধু।

একজন চাপা গলায় অন্যজনকে বলল, বয়ফ্রেন্ড।

অবসন্ন শরীরে আধমড়ার মতো বাড়ি ফিরলাম।

রক্তে ভেজা শাড়ি, কপালে কালসিটে, চোখেমুখে আতঙ্ক নিয়ে ঘরে পা দিতেই যে চেঁচামেচি উঠল তাইতেই বোধহয় মাথাটা ঝম করে অন্ধকার হয়ে গেল। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম।

পরদিন বিছানা ছেড়ে ওঠার সাধ্যই ছিল না। বাবা হাসপাতাল থেকে ঘুরে এসে বলল, ওঃ কী অব্যবস্থা! গেটপাস নেই বলে ঢুকতে দেয় না, বেড নম্বর জানি না, ওয়ার্ড জানি না, যাকেই জিজ্ঞেস করি কেউ কিছু বলতেও পারে না। সে কী হয়রানি! শেষে ইমার্জেন্সিতেই খুঁজে পেলাম। বেড নেই, মেঝেতে কম্বল পেতে শুইয়ে রেখেছে। নাকে নল, ড্রিপ। জ্ঞানও নেই। একজন নার্স বলল, অবস্থা খারাপ, অনেক রক্ত গেছে। পুলিশ স্টেটমেন্ট নিতে এসে ফিরে গেছে। তা কী আর করি, মধুবাবুও কলকাতায় নেই। বউরানিকে সব জানিয়ে এসেছি। ওঁরা যদি দয়া করে ওই নরক থেকে উদ্ধার করেন গরিবের ছেলেটাকে।

শুনে বুকের ভিতরটা শূন্য হয়ে যায়। অবস্থা খারাপ! কতটা খারাপ?

একটু বেলায় পুলিশ এ-বাড়িতেও এল। মনে পড়ল তখন ঘোরের মধ্যে হাসপাতালের খাতায় আমার ঠিকানাই লিখিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। দত্তবাড়ির কথা মনেই পড়েনি।

পুলিশ জেরার পর জেরা করতে লাগল আমাকে। স্পটটা কোথায়, কজন ছিল, কাউকে চিনি কিনা, কিরকম চেহারা, ভিকটিমের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী, লাভ

ট্র্যাঙ্গল আছে কিনা, পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল থাকা সম্ভব কিনা! একসময়ে ধৈর্য হারিয়ে আমি কেঁদে ফেললাম, ওসব নয়। এবার আমাকে ছেড়ে দিন।

একজন অফিসার বললেন, অন্তত ক্রিমিন্যালদের একটা বিবরণ দিন।

আমি তাদের আবছা দেখেছি। কিছু মনে নেই।

ওরকম অবস্থায় তাই তো হওয়ার কথা। তবু যদি জামা বা ট্রাউজারের রং, হাইট, বিল্ট বা চুলের স্টাইল কিছু বলতে পারেন, দেখুন না চেষ্টা করে।

চোখ বুজে দৃশ্যটা ভাববার চেষ্টা করলাম। করতে গিয়ে হু-হু করে চোখে জল এল।

অফিসার বললেন, স্টেডি হোন। কনসেনট্রেট করুন।

আমি চোখ মুছে ফের চেষ্টা করতে লাগলাম। দুজনের পরনেই ছিল গাঢ় রঙের টি-শার্ট আর কালচে প্যান্ট। ছিপছিপে চেহারা। একজন বেঁটে, অন্যজন সাধারণ হাইট

অফিসার মন দিয়ে শুনে টুকে নিতে নিতে বললেন, এই তো পেরেছেন। এবার আরও একটু ডিটেলসে যাওয়ার চেষ্টা করুন। মুখ দুটো মনে পড়ে কিনা কিংবা আবার দেখলে চিনতে পারবেন কিনা।

মাথা নেড়ে বললাম, পারব না।

চেষ্টা করুন ভয়েস তো শুনেছেন, কীরকম ভয়েস মনে পড়ে?

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

অবাঙালি টান আছে?

না।

অফিসার ভ্রূ কুঁচকে নোটবইয়ের দিকে চেয়েছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, যতদূর শুনেছি, এটা স্ন্যাচিং কেস। আপনার কী স্ন্যাচ করেছিল ওরা? হার না দুল না অন্য কিছু?

সীতাহারটার কথা আমার একদম মনে ছিল না। এবার মনে পড়ল। কাঁপা গলায় বললাম, একটা হার।

সোনার হার?

হ্যাঁ।

নিয়ে গেছে?

না। ওটা বাঁচাতে গিয়েই তো ওই অবস্থা হল ওর।

হারটা দেখাতে পারেন?

পারি।

ব্যাগ খুলে কাঁপা হাতে সীতাহারটা যখন বের করছি, তখন কেন যে মনে হচ্ছিল, ঝাঁপির ভিতর থেকে টেনে আনছি একটা বিষাক্ত সাপকে!

বিশাল হারটা দেখে অফিসারের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। হারের গায়ে এখনও রক্ত শুকিয়ে আছে।

অফিসার হাত বাড়িয়ে হারটা হাতে নিয়ে বললেন, এটা সোনার হার? আর ইউ সিওর?

হ্যাঁ। এটা সোনার হার।

মাই গুডনেস! কিছু মনে করবেন না এ হার আপনি কোথায় পেলেন?

দত্তবাড়ির বউরানি দিয়েছেন।

দিয়েছেন!

হ্যাঁ। মাঘমাসে আমার বিয়ে। এটা আমার বিয়ের প্রেজেন্টেশন।

দুজন পুলিশ অফিসার পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, এটার ওজন কত আপনি জানেন?

শুনেছিলাম পনেরো ভরি।

ব্যাপারটা খুবই আনইউজুয়াল। তাই না? বিয়ের উপহার হিসেবে কেউ কাউকে পনেরো ভরির হার উপহার দেয় বলে আপনি শুনেছেন?

আমি মাথা নেড়ে বলি, না। আমি নিতেও চাইনি। উনি জোর করে দিলেন।

বিয়েটিয়েতে বড়জোর এক-আধ ভরি সোনার গয়না দেওয়া হয়, তাও রেয়ার কেস-এ। কিন্তু পনেরো ভরি ইজ টু মাচ।

বললাম তো উনি জোর করে দিয়েছেন।

মিস ভট্টাচার্য, আপনি কলকাতার মেয়ে, এ শহরের ক্রাইম প্যাটার্ন অজানা নয়। তা সত্ত্বেও আপনি কি করে হারটা গলায় দিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন? এবং অন ফুট! বউরানির গাড়িতেই আমরা ফিরছিলাম। তেলিপাড়ার মোড়ে রাস্তা বন্ধ ছিল বলে আমরা হেঁটে আসছিলাম।

দ্বিতীয় অফিসারটি বললেন, হ্যাঁ, তেলিপাড়ার মোড়ে কাল রিপেয়ার হচ্ছিল। শি ইজ রাইট।

এনিওয়ে দত্তবাড়ির ঠিকানাটা আমাদের দিন। উই মাস্ট টক টু হার হাইনেস দি বউরানি। পনেরো ভরির হার যিনি উপহার দিতে পারেন শি মাস্ট বি এ ম্যাজেস্টিক লেডি।

বাবা ভয়ে বাঁশপাতার মতো কাঁপছিল। এগিয়ে এসে বলল, দিন স্যার, আমি লিখে দিচ্ছি ঠিকানাটা।

অফিসার বাবার দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি এই হারের কথা জানতেন?

না স্যার!

উনি আপনাকে বলেননি?

না স্যার, কাল ওই রক্তারক্তি কাণ্ডের পর ঘরে এসে ওর কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না।

জবাবটায় অফিসার খুব সন্তুষ্ট হলেন না, একটু গুম হয়ে থেকে বললেন, একটা অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে। হারটা আমরা থানায় নিয়ে যাচ্ছি। ভট্টাচার্যমশাইও চলুন। হারের জন্য রসিদ দিয়ে দেব।

আমি হঠাৎ একটু রেগে গিয়ে বললাম, আপনারা কি আমাকে চোর বলে সন্দেহ করছেন?

অফিসার থমথমে মুখে বললেন, দুনিয়ার কেউ সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। হারটা এক-দেড় ভরির হলে আমরা মাথা ঘামাতাম না। পনেরো ভরি বলেই মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

ও হার আমার চাই না। আপনারা বউরানিকে ফেরত দিয়ে দিতে পারেন।

আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে। এখন রেস্ট নিন। দরকার হলে আমরা পরে আসব।

বাবাকে নিয়ে পুলিশ চলে যেতেই আমি অবসন্ন মাথা বালিশে গুঁজে বিকল হয়ে কাঁদতে লাগলাম। হিক্কা উঠছে, মাথা পাগল-পাগল।

মা এসে মাথায় হাত রেখে বলল, কাঁদছিস কেন? চুরি তো আর করিসনি!

এটা অপয়া হার মা। ওটার জন্যই টুলুবাবু মরতে বসেছে, ওটার জন্যই পুলিশ আমাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চোর বলে গেল।

আহা, ভয় কী? ওরা বউরানিকে জিজ্ঞেস করলেই তো মিটে যাবে।

আমি হঠাৎ মাথা তুলে বললাম, বউরানি যদি অস্বীকার করে? যদি বলে হার আমাকে দেননি উনি?

বলিস কি? উনি কি আর অত খারাপ?

সময় খারাপ পড়লে সব হতে পারে মা।

সর্বনাস! তোকে যদি ধরিয়ে দেয় তা হলে কি হবে?

কেন, জেল খাটব। তোমাদের অত সাধের বিয়েটা হবে না। বেশ হবে। তাই হোক, আমার যত খারাপ হতে পারে হোক।

দুপুরের পর অবসন্ন শরীরে বাবা ফিরে এসে বলল, থানা আর হাসপাতাল দুই-ই সমান। একখানা রসিদ দিতে যে কতক্ষণ বসিয়ে রাখল! খিদেতেষ্টায় প্রাণ যায়। রসিদ পেয়েই ছুটলাম বউরানির কাছে, খোলসা করে সব বলতে। গিয়ে শুনি সেখানেই সাজ্ঘাতিক কাণ্ড।

মা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, কী কাণ্ড গো?

আর বোলো না। সকালে যখন গিয়েছিলাম তখন দিব্যি ভালই আছে দেখলাম। এই বেলা গিয়ে শুনি উনি নাকি গুচ্ছের ঘুমের বড়ি গিলেছেন। নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পেটে পাম্প করা হচ্ছে।

বলো কী? কেন?

কী করে বলব বলো! চাঁপা দাসী শুধু বলল, সে বেশি কিছু জানে না, তবে শুনেছে ছেলের সঙ্গে নাকি মায়ের খুব ঝগড়া হয়েছে। তার ফলেই এই কাণ্ড!

ছেলে! ছেলে তো একটুখানি। তার সঙ্গে ঝগড়া কিসের?

সেই তো ভাবছি। আমাদের কপালটাই খারাপ। পুলিশেও নানা রকম ইঙ্গিত করছে। বড্ড বিপদে পড়া গেল।

আমি উঠে বসলাম। মাথা টলছে। তবু বললাম। বাবার দিকে চেয়ে বললাম, অত ভাবছ কেন বাবা? আমাদের তো এসবই হওয়ার কথা। তোমাদেরও তো আকাঙ্ক্ষা ছিল, বউরানি আইবুড়োভাত খাইয়ে আমাকে একটা গয়নাটয়না কিছু দেবে। করোনি লোভ?

মা বলল, লোভ কেন বলছিস? তা নয়, অনেকে তো দেয়।

দিল তো মা! আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশিই তো দিল। তার ফল কি হল বুঝতে পারছ এখন?

মা-বাবা বজ্রাঘাতের মতো বসে রইল। আমি বালিশে মুখ গুঁজে বাঁধ-ভাঙা কান্নায় ভেসে যেতে লাগলাম। কত জল আমার চোখে আছে কে জানে।

বাবা শুধু বলল, বউরানি যদি না বাঁচেন তা হলে আমাদের বড় বিপদ হবে। স্নান করতে গিয়ে কলঘরেই অসুস্থ হয়ে পড়ল বাবা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলল, বোধহয় বেড়েছে। মাথা টলমল করছে বড্ড।

কাল রক্তমাখা শাড়িতে আমাকে বাড়ি ফিরতে দেখেছে কেউ কেউ। আজ পুলিশ এল। ছিনতাইয়ের ঘটনাও গুনগুন করে ছড়িয়ে গেছে। ফলে পাড়া প্রতিবেশীদের কৌতূহলি আনাগোনা শুরু হল। ক্লান্ত শরীরে একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকায় আমি বুঝতেই পারলাম না, মা আর টুসি কি বলে তাদের সামাল দিল। দুটো দিন কাটল অরন্ধনে, কান্নায়, আচ্ছন্নতায়, ভয়ে। দুইদিন পরে বাবা উঠে বলল, আমিও। বাবা! কীরে? টুলুবাবু কি বেঁচে আছে? বাবা ঠোঁট উল্টে বলল, কী করে বলব বল। আমি আজ একাবার ওকে দেখতে যাবো। এই শরীরে? হ্যাঁ বাবা। আমার তো তেমন কিছু হয়নি। শুধু শক, কিন্তু ওই ছেলেটা-

বলতেই চোখে জল এল, গলা আটকে গেল।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বড্ড ভাল ছেলেটা,

কলিকালে ভালরা কি টিকতে পারে? তা যাবি তো যা। সঙ্গে কাউকে নিস।

না বাবা, একাই পারব।

ইমার্জেন্সির শেষ মাথায় বাঁ-দিকে খুঁজে পাবি তাকে।

পাব কিনা জানি না। কিন্তু যাব। যেতেই হবে। ঘোরের মধ্যে শুধু তাকেই বারবার দেখেছি। রক্ত মাখা হাতে সীতাহার ঝুলে আছে, মুখে একটু কাতর হাসি। হিন্দি ছবির হিরোরা ওরকম করে বটে, কিন্তু সেটা কত মিথ্যে।

অগ্রাহায়ণের একটু শীতের বাতাস বইছে আজ। ফর্সা রোদ। বেলা দশটায় থানা থেকে লোক এসে বলল, ভট্টাচার্য মশাইকে বড়বাবু ডেকেছেন।

বাবা শশব্যস্তে বেরিয়ে গেল। ফিরতে খুব একটা দেরি হল না।

মুখে একগাল হাসি।

মা বলল, কী হল গো!

উঃ, জোর একটা ফাঁড়া কাটল।

কি হল বলই না।

প্লাষ্টিকে আর কাগজে মোড়ানো সীতাহারটা খুলে মার হাতে দিয়ে বাবা বলল, এই সেই সীতাহার। সাবান জল দিয়ে ধুয়ে নিও। এখনও রক্ত লেগে আছে।

বউরানি তাহলে বেঁচে আছে?

না বাঁচলে কি আর আমরা বাঁচতাম? তবে বড়বাবু বলেছেন, এটা যে উপহার সেটা বউরানিকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে। আমি আর অত ঝামেলায় গেলাম না, চুরির অপবাদটা যে হয়নি সেটাই বাঁচোয়া।

আমার অনন্দ হয় না, বুক থেকে ভারও নামে না, জেলে হলেও যেন আমার কিছু যেত-আসত না। মা হারটা আমার কাছে আনছিল, আমি ঘেন্নায় শিউরে উঠে বললাম, কাছে এনো না মা, ওটা তোমার কাছে রেখে দাও।

কপালে কালসিটের জায়গাটা এখনও নীল হয়ে ফুলে আছে। মুখটা শুকনো, খড়ি উঠছে, দু'তিন দিনেই বড্ড ঝরে গেছে শরীর। তবুও বিকেলে আমি সামান্য সাজলাম।

হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ারে যেন রাসমেলার ভিড়। কোথায় যে খুঁজব তাকে! ইমার্জেন্সিতে ঢুকতেই দিচ্ছিল না। আমি কেঁদে ফেলায় বোধহয় দয়া হল গেটের লোকটার। বলল, যান, কিন্তু তাড়াতাড়ি আসবেন।

না, বাবা যেখানে বলেছিল সেখানে সে নেই, বুকটা হঠাৎ হাহাকারে ভরে গেল। নেই মানে কি নেই? কিন্তু আমাকে যে খুঁজতেই হবে। এ পৃথিবীতে যদি খুঁজে না পাই, তাহলে পরজন্মেও যে খুঁজতে হবে তাকে।

এক পা এক পা করে এগোচ্ছি, প্রতিটি দিকে চোখ রেখে রেখে, ক্রমে ঘরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছি। শরীর হিম হয়ে আসছে, মাথা টলমল, চোখ ঝাপসা।

কেউ ডাকল? থমকে দাঁড়াই. না. কে ডাকবে?

এই যে! কাকে খুঁজছেন?

ঝাপসা চোখের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই, খোঁচা, খোঁচা দাড়িওলা একখানা হাসি মুখ। বিশ্বাস হল না. রুমালে চোখ মুছে ভাল করে চাইলাম। হঠাৎ এক বিপুল আনন্দের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছিল বুক। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। রক্তের বিপুল বন্যায় শরীর দুলছে।

কাল আমাকে বেড দিয়েছে।

আমি আস্তে আস্তে তার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াই।

আমাকে খুঁজছিলেন?

চোখের জল মুখে লাভ নেই। কিছু বলার চেষ্টা করে লাভ নেই।

উঠে বসবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করতে গিয়ে ফের বালিশে মাথা ফেলে দিয়ে বলল, কেন কাঁদছেন?

কেন কাঁদছি তা যদি ওকে বোঝাতে পারতাম!

ড্রিপ খুলে দিয়েছে। অকসিজেন লাগছে না। ডাক্তার বলেছে আউট অফ ডেনজার, কী মজার বলুন! আউট অফ ডেনজার মানেটাই ডাক্তার বাবু জানেন না। আমার মতো মানুষ কবে বাঁচে. কবে মরে তার কিছু ঠিক আছে?

আমি তার পাশে বসলাম। গলায় কান্নার পুঁটুলি আটকে আছে কথা বলতে পারছি না। তাই হাতটা বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে থাকি।

নির্ণিমেষ আমার দিকে চেয়ে ও বলে, বড্ড রোগা হয়ে গেছেন।

তারপর চুপচাপ দু'জনে বসে থাকি. পরস্পরের চোখে চোখ, নিষ্পলক, চারিদিকে ভিড়, চেঁচামেচি, আমাদের আর কোনও কথা হয় না। তবু কত কথা হয়, কত কথা যে ওড়াউড়ি করে বাতাসে।

কানাডায় যখন একজনের ঘর করব তখন বুকে বাস করবে অন্য একজন। আমি জানি. বাকি জীবন আমাকে এক দ্বিচারিণী হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।